KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩০/- ৩০/- ৩১/- ৩১/-	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৮৯ || May 1982 কার্তিক ১৩৮৯ || Nov 1982 বৈশাখ ১৩৯০ || May 1983 কার্তিক ১৩৯০ || Nov 1983
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ত্রিংশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

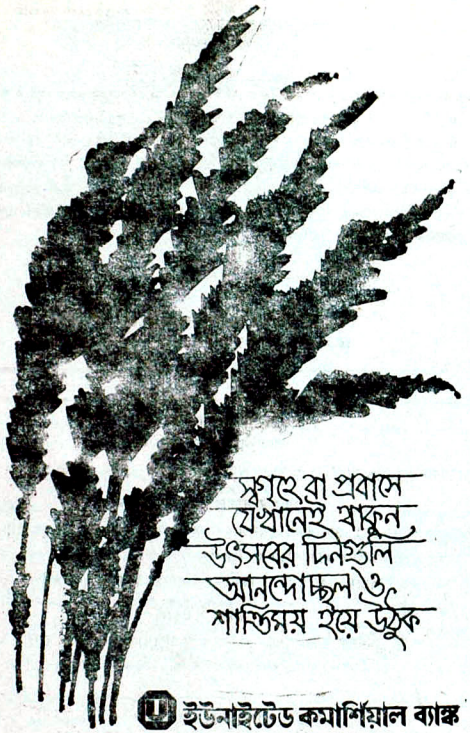

UCO/CAS-117/82 BEN

ত্রিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক তেরশ উননব্বই

সমকালীন ।। প্রবন্ধের পত্রিকা

সূচীপত্র

বর্ণপরিচয় : শৈলেনকুমার দত্ত ৪৯

আলংকারিক রাজশেখর ও কাব্যহরণ-প্রসঙ্গ : মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫

বিস্মৃতপ্রায় মনীষী কালীকৃষ্ণ মিত্র : অজয়কুমার ঘোষ ৬২

অন্নবাঞ্জন সুখাদ্য ও সুপাচ্যই : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ৭০

চিকিৎসা-শাস্ত্রের হারিয়ে যাওয়া একটি তথ্য : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ৭৫

সমালোচনা ঃ উনিশ শতকের বাঙলা-সাহিত্যে কেশবচন্দ্র : অধীর দে ৭৮
নদী : ত্রিদিবকুমার বসু ৭৯

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিন্টার্স ২, ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৮৭ হইতে প্রকাশিত।

বিশ্বভারতীর বই

নাট্যসংগ্রহ ।। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত যাবতীয় নাটক একত্র প্রকাশিত। মূল্য ১৪·০০; শোভন ১৬·০০

নারীর উক্তি ।। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বর্তমান স্ত্রী-শিক্ষা বিচার, সম্বন্ধ, আদর্শ, ভদ্রতা, পাটেল-বিল, বঙ্গনারী, কং পন্থা; ইত্যাদি নিবন্ধ। মূল্য ৩·৪০

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ।। শ্রীরানী চন্দ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির চিত্তাকর্ষক কাহিনী এবং ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়। বহু চিত্র ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অলংকৃত মূল্য ১০·০০; শোভন ১২·০০

অবনীন্দ্রনাগ ।। শ্রীলীলা মজুমদার

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা সাফল্যলাভ করেছেন এই গ্রন্থে তা আলোচিত হয়েছে। মূল্য ১০·০০

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ ।। শ্রীমলিনা রায়

রবীন্দ্রনাথের সহকারী বন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজের বহু বিচিত্র জীবনের সরস ও সুখপাঠ্য আলেখ্য। মূল্য ১০·০০

পথে বিপথে ।। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্প কতটা কাব্যধর্মী হতে পারে পথে-বিপথের গল্প কয়টি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মূল্য ৫·৫০

শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত ।। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

শিল্প-শিক্ষার্থী এবং শিল্প-জিজ্ঞাসুদের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। মূল্য ২০·০০; শোভন ২৪·০০

দক্ষিণের বারান্দা ।। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর দুই ভাই ছবিতে গল্পে কৌতুকে আনন্দে রূপে-রসে মিলিয়ে যে অপূর্ব ইতিহাস রচনা করেছিলেন তার অনবদ্য চিত্র। মূল্য ২০·০০

রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য ।। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে একটি বৃহৎ দেশকালের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস। মূল্য ১২·০০, শোভন ১৫·০০

শান্তিনিকেতনের এক যুগ ।। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গঠনকর্ম থেকে আরম্ভ করে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা, এবং পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হয়ে যাঁরা হাত মিলিয়েছেন তাঁর কাজে—তাঁদের মধ্যে পরলোকগত বিশেষ কয়েকজনের স্মৃতিও শ্রুতি-চারণ সচিত্র। মূল্য ২৫·০০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয়: ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা ৭০০০১৭.

বিক্রয়কেন্দ্র: ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

সমকালীন

বর্ষ ৩০ কার্তিক ১৩৮৯

বর্ণপরিচয়

শৈলেনকুমার দত্ত

বিদ্যাসাগর তখন বিদ্যালয়-পরিদর্শক। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তো আছেনই। সুযোগ পেলে তিনি পরিদর্শনে বেরোন; হুগলী-হাওড়া-বর্ধমান-মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল তাঁর গন্তব্যস্থল। শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি তখন একজন পরিদর্শকরূপী স্থপতি। কোথাও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শুনলেই তিনি সেখানে ছুটে যান, পরিকল্পনাকে সর্বতোভাবে কার্যকরী করতে প্রাণপণ সাহায্য করেন। পায়ে হেঁটে অথবা পাল্কি চেপে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়ান তিনি, তারপর সময় সুযোগ পেলেই অভিন্নহৃদয় বন্ধু প্যারীচরণের চোরবাগানের বাড়িতে গিয়ে সেখানে গল্প করতেন। প্যারীচরণ সরকার তখন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। এদেশে শিক্ষাবিস্তার নিয়ে দুই মহারথীর মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। শিক্ষালাভের প্রথম সোপান পাঠ্যপুস্তকের অভাবটা তখন দুজনেই অনুভব করেন। 'বোধোদয়' রচনা করার সময়ে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার যেসব ত্রুটি দেখেছিলেন, প্যারীচরণকে সেকথাও বলেন।

এমনি একদিন কথায় কথায় দুই বন্ধুতে পরিকল্পনা করে ফেললেন। ঠিক হল, পাঠ্যপুস্তকের এই অভাবটা তাঁরাই দূর করবেন। বিদ্যাসাগর ভার নিলেন বাংলা, আর প্যারীচরণ ভার নিলেন ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক রচনার। এই পরিকল্পনারই ফলশ্রুতি হল বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়', আর প্যারীচরণের 'ফার্স্ট বুক অফ রিডিং'। বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়ে গেল এমনি আকস্মিকভাবে।

বিদ্যাসাগরের দেহমনে তখন যৌবনের উদ্যম আর অফুরন্ত কর্মশক্তি। কর্মযজ্ঞে তিনি তখন নিবেদিতপ্রাণ। সময়ের একান্ত অভাব দেখে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যে বসেই বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি

রচনা করে ফেললেন। ১২৬২ বঙ্গাব্দের শুভ নববর্ষের দিন (১৩ই এপ্রিল, ১৮৫৫) বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ প্রকাশিত হল, আর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হল ঐ বছরেরই 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' (১৪ই জুন, ১৮৫৫)।

নিতান্ত সাদামাটা ছাপায় নীর্ণ কলেবর একখানি গ্রন্থে বঙ্গদেশে নিঃশব্দে একটি বিপ্লব ঘটে গেল। প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাংলাভাষায় দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ ঌ কারের প্রয়োজন নাই। এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।'

রক্ষণশীল বঙ্গসমাজে এতেই হৈ চৈ পড়ে গেল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, পঞ্চানন তর্করত্ন, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করলেন। কেউ কেউ দীর্ঘ ঋ-কারের ব্যবহার হিসাবে 'পিতৃণ' শব্দটিরও উল্লেখ করলেন। কিন্তু দেসব আর কদিনের জন্যে! তবে বিদ্যাসাগর আঘাত পেলেন যে, সাধারণ মানুষও গ্রন্থটিকে খুব বেশি সমাদর করল না। তখন কি তিনি জানতেন যে, মহাকালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে 'বর্ণপরিচয়' খাঁটি সোনার মর্যাদা লাভ করবে!

এবার বর্ণপরিচয়ের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক শিশুপাঠ্য বইগুলির দিকে একবার চোখ বুলানো যাক।

সেসময় শিশুশিক্ষার অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বই ছিল—'বর্ণবোধ', 'শিশুবোধক', ক্ষেত্রমোহন দত্তের 'শিশুসেবধি' (১-৩, ১৮৫৩৫৪), স্কুল বুক সোসাইটির 'বর্ণমালা' (১-২, ১৮৫২, ৫৪) এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' (১-৩, ১৮৪৯-৫০)। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' 'বর্ণমালা'র উল্লেখ করেছেন, আর কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'আত্মচরিতে' আছে 'বর্ণবোধের' উল্লেখ। কিন্তু বলা নেই যে, সেসব বই কেমন ছিল! 'বর্ণমালা'র একটি পুরোনো বিজ্ঞাপন আছে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (সংখ্যা—১২৮)। বিজ্ঞাপনের মধ্যেই গ্রন্থের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে—

"বিজ্ঞাপন। ইংরেজি-বাংলা বর্ণমালা। স্কুল বুক সোসাইটি প্রণীত ইংরেজি স্পেলিং নং ১ বাংলা সাধুভাষায় অনুবাদপূর্বক উত্তম বিলাতি কাগজে প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী অথবা চিপ লাইব্রেরীতে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এরূপ সুলভ করা গিয়াছে যে, ইংরেজি শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকেও ইংরেজি বর্ণমালা শিক্ষা হইতে পারে এ কারণ যাঁহারা দিগের ইংরেজি শিক্ষা করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও উপযুক্ত শিক্ষক অভাবে ইচ্ছা সম্পূর্ণ হয় না, ইহাতে তাঁহারা দিগের বহু উপকার দর্শিবে তাহার সন্দেহ নাই।"

অপর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'শিশু সেবধি'র উল্লেখ কোথাও কোথাও থাকলেও, 'শিশুবোধকে'র কিন্তু অনেক প্রশংসা আছে। লং সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত 'এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অফ বেঙ্গলী ওয়ার্কস' (১৮৫৫) গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন—'দিজ বুক, দি লিওনে মারে অফ বেঙ্গল হ্যাজ পাসড থ্রু ইনিউমারেবেল এডিসনস। দিজ বুক হ্যাজ বিন ফর সেঞ্চুরীজ দি কি টু বেঙ্গলী রিডিং।' লং সাহেব গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি সম্ভবত ভুল। কারণ

বঙ্কিমচন্দ্র 'শিশুবোধক' পড়েছিলেন। বঙ্কিমজীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—'তখন বর্ণপরিচয় ছিল না, শিশুবোধক ছিল।' প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মসাল ১৮৩৮ এবং তাঁর বর্ণপরিচয় হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে। বাংলা গদ্যের আর এক অবিস্মরণীয় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে বলেছেন—'শিশুবোধক পড়তুম বড় চমৎকার বই অমন বই আমি আর দেখিনে।'

বইখানি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন, তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—'আমাদের পড়ার বই ছিল—'শিশুবোধক'। এই কল্পতরুর নিকট চতুর্বর্গ ফল পাওয়া যাইত। 'নামতা', 'কড়াকিয়া' হইতে দাতাকর্ণের কবিত্ব, ক, খ, গ, ঘ হইতে স্ত্রী ও স্বামীর পত্র লেখার সেই অপূর্ব ধারা—শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি' সাধনপ্রয়াসী মালতীমঞ্জরী দেবী ও সীতান্তে নিতান্ত সংযোগ প্রভৃতি বিরহীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক নানাকথা আমরা একটি শব্দমাত্র না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়াছি। কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে আমাদের দেশসুলভ মোটা বেতের আঘাতে পৃষ্ঠদেশ কণ্টকিত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের এনসাইক্লোপিডিয়ার এই ক্ষুদ্র সংস্করণে পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলি ও বিরহী বিরহিণীর পত্রব্যবহার ছাড়া দাখিলা, আদালতে আরজি ও পিতার নিকট পত্র লেখার ধারা লিপিবদ্ধ ছিল। এই পুস্তক পড়া শেষ করিয়াই অনেক পড়ুয়া কর্মক্ষেত্রে নামিতেন—তাঁহারা কেহ হইতেন গ্রামের পাটোয়ারী তহশীলদার; এমন কি পঞ্চায়েতের সর্দার হইতেন। এই শিক্ষার বলে কিছুতেই আটকাইত না।'

সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন—'পাঠ্য অপাঠ্যের সীমারেখার ঠিক মাঝখানের একখানি ছেঁড়া পুস্তক হাতে আসিয়াছিল—তুলট কাগজের মতন কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা, ফাঁপা ফোলা পিচবোর্ডের মলাট। অতি চমৎকার খোদাইচিত্র সম্বলিত। অন্তত সেই কালে চমৎকার মনে হইত। বইটির নাম শিশুবোধক। এই মহামূল্য গ্রন্থখানি কাহার রচনা বা সঙ্কলন তাহাও জানিতে পারি নাই।'

প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন একটি বিশিষ্ট লেখকগোষ্ঠী। সেই সঙ্গে খ্যাতনামাদের রচনাও ছিল। তার মধ্যে 'গুরুদক্ষিণা' রচনা করেন অযোধ্যারাম, 'গঙ্গাবন্দনা' মুকুন্দরামের রচনা আর 'দাতাকর্ণ' ও 'কলহভঞ্জন' রচনা করেন তাঁরই অগ্রজ কবিচন্দ্র। গ্রন্থটি শিশুপাঠ্য না হলেও, একদিক থেকে সর্বার্থসাধক ছিল। কি ছিল না এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে! ইংরেজি-বাংলা বর্ণমালা থেকে শুরু করে ধারাপাত, আর্যা, পত্রলিখন প্রণালী, অঙ্কশিক্ষা, কালিনির্ণয় এবং চাণক্য শ্লোক পর্যন্ত। পত্রলিখন পর্যায়ে 'স্বামীকে স্ত্রীলোকের পত্র লিখিবার ধারা' উদাহরণে একটি পত্রের নমুনা অংশ বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে—

'শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতী মঞ্জরী দেবী। প্রণম্য শ্রিয়ার প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ার শ্রীপদ সরোজহ স্মরণমাত্র অত্র শুভবিশেষ।'

তবে ভাল রচনাও ছিল। প্রসঙ্গত, একটি কবিতা উল্লেখ করার মত—

মাতার সমান নাই, শরীর পোষিকা।
ভার্যার সমান নাই, শরীর তোষিকা॥

বিদ্যার সমান নাই, শরীর ভূষিকা।
চিন্তার সমান নাই, শরীর শোষিকা॥

'শিশুবোধকের' পর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল বিদ্যাসাগরের সহপাঠী এবং অকৃত্রিম বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য রচিত শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগ বেথুন সাহেবকে উৎসর্গ করে মদনমোহন লেখেন—'অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাবে অস্মদেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষত বালিকাগণের শিক্ষা-সংশোধন করিবার আশায় যে পুস্তক পরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।

'বর্ণপরিচয়' রচনা করার সময় বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থটির কাছে কি পরিমাণ সাহায্য পেয়েছিলেন, গ্রন্থ দুটি পাশাপাশি রাখলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'শিশুশিক্ষা'র অক্ষর সংখ্যা বেশি থাকলেও, মদনমোহন 'কালোপযোগী পুস্তক' রচনার দায়িত্ব যে কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছিলেন, গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ আছে। মদনমোহন নিজে সুকবি ছিলেন, তাঁর দুটি যুগান্তকারী রচনা 'পাখী সব করে রব রাত্রি পোহাইল' এবং 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই' কবিতা দুটি 'শিশুশিক্ষা'তে প্রথম প্রচারিত হয়।

কানপাতলে 'বর্ণপরিচয়ে'র বহু স্থানে 'শিশুশিক্ষা'র পদধ্বনি শোনা যায়। মদনমোহন লিখেছেন—'পাঠের সময় গোল করিও না। গুরুজনের নাম ধরিয়া ডাকিও না। ক্ষুধিত জনে ভোজন করাইবে। কাহারও সহিত বিবাদ করা ভাল নয়।' বিদ্যাসাগর লিখেছেন—"দেখ রাম কাল তুমি পড়িবার সময় বড় গোল করিয়াছিলে, পড়িবার সময় গোল করিলে ভাল পড়া হয় না, কেহ শুনিতে পায় না।'

'শিশুশিক্ষা'র আছে—

ধর বচন কর রচন
পর বসন খর দশন
চল ভবন বন পবন
জল পতন ফল হরণ।

'বর্ণপরিচয়ে' এই পাঠটি আরো বেশি উৎকর্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—

বড় গাছ ভাল জল
লাল ফুল ছোট পাতা
পথ ছাড় জল খাও
হাত ধর বাড়ি যাও।

সংযুক্ত বর্ণের পাঠগুলিতেও এই অনুসৃতি আছে। মদনমোহন লিখেছেন—

কটু বাক্য কহা অনুচিত।
কুকাজ করিলে অখ্যাতি হয়।

বিদ্যাসাগর লিখেছেন—কখনও কাহাকেও কুবাক্য বলিও না। কুবাক্য বলা বড় দোষ। যে কুবাক্য বলে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।

কিন্তু একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য সর্বত্র প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। মদনমোহন যেখানে আটচালা নির্মাণ করেছেন, বিদ্যাসাগর তাতে আড়াদিন দিয়েছেন; মদনমোহন যেখানে শুধুমাত্র দেহনির্মাণ করেছেন, বিদ্যাসাগর সেখানে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু বর্ণপরিচয়ের এই যুগান্তকারী মর্যাদার অন্তরালে মদনমোহনের অবদানের কথা স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য। মদনমোহনের প্রতিভা এবং রচনাশক্তি কম ছিল না, শুধু অনুশীলনের অভাব ছিল। তা না হলে হয়তো সমস্ত ব্যাপারটাই অন্য রকম হত। আশ্চর্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ভাষায় বলতে গেলে—'তিনি যদি ডিপুটিগিরি চাকরি করিতে না গিয়া বাংলা সাহিত্যসেবায় রত থাকিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসা পুষ্পাঞ্জলি কেবল বিদ্যাসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি, তাহা অর্ধেক ভাগ করিয়া দুইজনকে দিতে হইত।'

প্রকৃতপক্ষে 'শিশুশিক্ষা' না থাকলে, 'বর্ণপরিচয়' কি রূপ লাভ করত, তা অনুমানের বিষয়। বর্ণপরিচয় রচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর 'শিশুশিক্ষার' প্রায় সব রীতির অনুসরণ করেছেন। এমন কি সংযুক্ত ও অসংযুক্ত বর্ণের জন্য দুটি পৃথক গ্রন্থের কাঠামো পর্যন্ত!

'বিদ্যাসাগর চরিতে' অক্ষয় শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন—'অগ্রজ মহাশয় শিশুগণের শিক্ষার সুবিধার জন্য বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ নূতন প্রণালীতে প্রচারিত করিলেন। বালকদিগের প্রথমপাঠ এরূপ পুস্তক ইতিপূর্বে কেহ প্রকাশ করে নাই। সন ১২৬২ সালের সালের ১লা আষাঢ় অগ্রজ মহাশয় বালক-বালিকাদিগের সংযুক্ত বর্ণপরিচয় শিক্ষার সৌকার্যার্থে দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় নাম দিয়া নূতন প্রণালীতে এক পুস্তক মুদ্রিত করিলেন। উহা যে প্রণালীতে রচনা করিয়াছিলেন, সেরূপ প্রণালীতে পূর্বে কেহ কখনও করেন নাই।'

কথাটি সত্য। বর্ণপরিচয় গ্রন্থে তিনি যে শুধু প্রচলিত ধারাটি ভেঙে দিলেন, তাই নয়, আগাগোড়া একটি অনবদ্য গদ্যছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র ছন্দ যে বালক রবীন্দ্রনাথের কান সজাগ করেছিল তাঁর জীবনচরিত পাঠকেরা তা জানেন।

'বর্ণপরিচয়ে' বর্ণিত শিশু-চরিত্রগুলিও বিদ্যাসাগরের গভীর মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার ফসল। রাম, নবীন, গোপাল, রাখাল প্রভৃতি বালকেরা সব শ্রেণীর বালকেরই প্রতিনিধিস্থানীয়। তবে একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম হল, বিদ্যাসাগরের মত একজন প্রগতিবাদী স্রষ্টাও গ্রন্থের কোথাও কোন বালিকার কথা লেখেননি।

তাঁর সৃষ্ট বালক-চরিত্রগুলির মধ্যে গোপাল ও রাখাল হল দুই গোলার্ধের প্রতিনিধি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই অবিস্মরণীয় চরিত্র দুটি ভুলতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তাই তিনি যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছেন। 'বিদ্যাসাগর চরিতে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাহাকে বাপ মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোন কোন অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য

দেখা যাইত।' তবে লেখাপড়ার ব্যাপারে যে রাখালের সঙ্গে তাঁর আদৌ মিল ছিল না, রবীন্দ্রনাথ সেকথাও লিখেছেন।

বিলাত-প্রবাসী দ্বিজেন্দ্রলাল একবার একটি পত্রে লিখেছিলেন—'আমাদের দেশে প্রায় সকলেই গোপাল যাহা পায়, তাহাই খায়; ভাল খাইব ভাল পরিব বলিয়া আব্দার করে না। যতদিন বাঙালী 'রাখাল' হইতে না শিখিবে, ততদিন তাহাদের পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতাও ঘটিবে না।'

'বর্ণপরিচয়ে'র বালকচরিত্রগুলির মধ্যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক অনুধ্যানেরও পরিচয় আছে। প্রথম ভাগের রাম, গিরীশ, নবীন প্রভৃতি বালকেরা পড়াশুনা করে না, কুকথা বলে এবং স্কুল কামাই করে; কিন্তু দ্বিতীয় ভাগের নবীন, যাদব প্রভৃতি বালক শুধু যে নিজেরাই পড়াশুনা করে না, তাই নয়, অপরকেও পড়াশোনা করতে বাধা দেয়! এখানেই বিদ্যাসাগরের অসামান্যতা!

'বর্ণপরিচ'য়ের যুগোত্তীর্ণ সম্পদ ছাড়া তার একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিকও আছে। বাংলা পাঠ্য-পুস্তকে প্রথম বর্ণপরিচয়ের মধ্যেই প্রতিটি অক্ষরের সঙ্গে এক একটি ছবি দেবার রীতি প্রবর্তিত হয়। প্রবর্তন করেন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। নবরূপে প্রকাশিত বর্ণপরিচয়ের জনপ্রিয়তাও প্রচণ্ডভাবে বাড়তে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যে দুলক্ষেরও বেশি 'বর্ণপরিচয়' বিক্রী হয়।

কিন্তু এহো বাহ্য। একখানি ক্ষীণ-কলেবর পুস্তিকা একশ' বছর পেরিয়ে যে ভাবে একটি বিশাল জাতির ভার বহন করে যাচ্ছে, তার তুলনা বিরল। বর্ণপরিচয় প্রকাশের পর এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বাংলা ভাষায় অক্ষর পরিচয়ের অজস্র বই প্রকাশিত হয়েছে, নানা বর্ণ ও বৈচিত্র্যে; কিন্তু বর্ণপরিচয়ের মর্যাদা কেউ খর্ব করতে পারেনি। পরবর্তীকালের দুটি প্রস্ফুটিত কুসুম রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশী'র শিকড় পর্যন্ত গেলেও হয়তো বর্ণপরিচয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে।

আলংকারিক রাজশেখর ও কাব্যহরণ-প্রসঙ্গ

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যধারার অজস্র শাখা-প্রশাখার মধ্যে সবচেয়ে সম্পৎশালী হল অলঙ্কার-সাহিত্য —যাকে সাধারণভাবে অলঙ্কার শাস্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়। প্রায় অর্ধশতাধিক আলঙ্কারিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের নানা খুঁটিনাটি দিক নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই সব আলঙ্কারিকদের মধ্যে কেউ কেউ ধ্বনি, রস প্রভৃতি কাব্যসৌন্দর্যসম্পাদক কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দিয়ে তাঁদের বক্তব্যের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠাপিত করেছেন। যেমন, ধ্বন্যালোক-রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধন, রসগঙ্গাধর প্রণেতা জগন্নাথ প্রভৃতি। মম্মটভট্ট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি কয়েকজন আলঙ্কারিক অলঙ্কারশাস্ত্রের সম্ভাব্য সকল বিষয়ের উপরই কম বেশী গুরুত্ব দিয়ে নিজের নিজের অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করেছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর আলঙ্কারিকদের সংখ্যাই বেশী। অতি প্রাচীনকাল থেকে আলঙ্কারিকদের ক্রমাগ্রগতির পথে নবম-দশম শতাব্দীর যাযাবর-কুলোৎপন্ন রাজশেখরের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 'যাযাবর' শব্দটির দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নির রক্ষক ও শৈবধর্মের উপাসক একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে বোঝায়। রাজশেখরের বাবার নাম দুর্দুক ও মায়ের নাম শীলবতী। এঁরা ছিলেন মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। রাজশেখর কনৌজের রাজা মহেন্দ্রপালের শিক্ষক ও পরে তাঁর রাজসভার সভাকবি হন। মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপালও রাজশেখরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

অন্যান্য অলঙ্কারশাস্ত্রের রচয়িতাদের থেকে বহু বিষয়ে রাজশেখরের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। সাধারণ ভাবে আলঙ্কারিকেরা যে রস, গুণ, রীতি প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্যাঙ্গিকের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, সেই অতি পরিচিত পথ রাজশেখর অনুসরণ করেন নি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একটু স্বতন্ত্র। 'কাব্যমীমাংসা' নামে বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি সযত্নে কবিসৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করেছেন। কেমনভাবে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা সম্ভব তারই রহস্যোন্মোচনের দিকেই তাঁর সজাগ-দৃষ্টি রেখেছেন।

রাজশেখর ছিলেন প্রধানতঃ নাট্যকার ও কবি। বালরামায়ণ, বালভারত, বিদ্ধশালভঞ্জিকা ও কর্পূরমঞ্জরী নামে চারখানি বিখ্যাত নাটকের ও হরবিলাস নামে একটি মহাকাব্যের রচয়িতা তিনি। তাই অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করতে গিয়ে তিনি শুধুমাত্র প্রাচীনরীতি অনুসরণ করে অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচার করেন নি। তিনি করেছেন কাব্যবিদ্যার অভিনব আলোচনা। তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তু—কাব্যবিদ্যার অধিকারী কারা? কবিত্বের হেতু কি? প্রকৃত কাব্যসমালোচক কে? কাব্যের বিষয়বস্তুর উৎস কোথায়? সৎ কবির পৃষ্ঠপোষক রাজার কবির প্রতি কর্তব্য কি? এই সব বিভিন্ন পূর্ব-আলোচিত বিষয়ের বিস্তৃত পর্যালোচনায় 'কাব্যমীমংসা' গ্রন্থটি পরিপূর্ণ। আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অলঙ্কার গ্রন্থের আগাগোড়াই রাজশেখরের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নূতন চিন্তাধারার আকর্ষণীয় ফসল। তাই মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কানে রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন—"It is rather in the nature of a practical handbook for poets."

এই 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিচিত্র আলোচনা হল কাব্যহরণ (plagiarism) প্রসঙ্গ। এই বিষয়ের দীর্ঘায়িত পর্যালোচনা করা হয়েছে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। রাজশেখরের আগে কোনও আলঙ্কারিক এত বিস্তৃতভাবে কাব্যহরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন নি। আচার্য বামন এই প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র করেছেন এবং আনন্দবর্দ্ধন এই প্রসঙ্গকে বিস্তৃতি দিয়েছেন। তিনি ধ্বন্যালোকের চতুর্থ উদ্যোতে বলেছেন—

সংবাদো হ্যন্যসাদৃশ্যং তৎপুনঃ প্রতিবিম্ববৎ।
আলেখ্যাকারবত্তুল্যদেহিবচ্চ শরীরিণাম্ ॥

অর্থাৎ, একটি কাব্যবস্তুর সাথে অন্য কাব্যবিষয়ের যে সাদৃশ্য তাকে 'সংবাদ বলা হয়। এই 'সংবাদে'র তিনটি ধারা আছে। প্রথমতঃ, কোনও কাব্যবস্তু অন্য কাব্য বিষয়ের অবিকল অনুসরণের দ্বারা সাদৃশ্যলাভ করে। একে বলা হয় 'প্রতিবিম্ববৎ'। দ্বিতীয়তঃ, কোনও কাব্যের বিষয়বস্তু অন্য কাব্যবস্তুর সাথে আলেখ্যের সঙ্গে সাদৃশ্যের মত। তৃতীয়তঃ, এক কাব্যের বিষয়বস্তু অন্য কাব্যের সঙ্গে তুল্যদেহীর মত অর্থাৎ এক দেহীর তুল্য অন্য শরীরীর যে সাদৃশ্য থাকে সেই রকম সাদৃশ্যযুক্ত।

এই তিনপ্রকারের সাদৃশ্যের মধ্যে প্রথম দুই প্রকার সাদৃশ্যকে পরিহার করে তৃতীয় প্রকার সাদৃশ্যকে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আনন্দবর্দ্ধন। আনন্দবর্দ্ধন ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন যে, কাব্যের বিষয়বস্তু অভিনব হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই পূর্ববর্তী কবি যে বিষয়বস্তু অবলম্বনে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন, পরবর্তী কবির পক্ষে তা গ্রহণ করায় কোনও গুণ নেই। অতএব—

পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসো বস্তু সুকবেঃ
সরস্বত্যৈবৈষা ঘটয়তি যথেষ্টং ভগবতী ॥ (ধ্বন্যালোক, চতুর্থ উদ্যোত)

—যে সুকবি পরের দ্রব্য গ্রহণ করতে চান না, তাঁর নিজের ঐশ্বর্যময়ী বাণী উপযুক্ত কাব্যবস্তু সৃষ্টি করতে সহায়তা করে।

কাব্যহরণ ব্যাপারের নিন্দা করে নাট্যদর্পণ রচয়িতা রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র বলেছেন—"অন্যকাব্যৈঃ কবিত্বং তু কলঙ্কস্যাপি চূলিকা"—অন্যের কবিতা নিজের করে নিয়ে কবিখ্যাতি অর্জন করা কলঙ্কের মূল। মহাকবি বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের প্রারম্ভে দ্ব্যর্থক একটি শ্লোকের মাধ্যমে কাব্যচোরকে নিন্দা করেছেন।—

"অন্যবর্ণপরাবৃত্ত্যা বন্ধচিহ্ননিগূহনৈঃ।
অনাখ্যাতঃ সতাং মধ্যে কবিশ্চৌরো বিভাব্যতে ॥

—যে সব মন্দমতি কবি সৎ কবিদের লেখা এবং বর্ণ-বন্ধের পরিবর্তন ক'রে বা বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্যদ্যোতক চিহ্ন গোপন ক'রে কবি-প্রশংসা পেতে চান, কেউ বলে না দিলেও সুকবিদের মধ্যে তাঁরা চোর বলে গণ্য হন।

কাব্যহরণ বিষয়ের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন রাজশেখর। নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের সময় তিনি তাঁর সম্ভাব্য বিরুদ্ধবাদীদের মত উত্থাপন ক'রে যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করেছেন এবং স্বসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। একথা বহুলাংশে সত্য যে, শব্দ ও অর্থের উপযুক্ত মিলনকেই কাব্য বলা হয়। অতএব অন্য কবি কর্তৃক প্রযুক্ত শব্দ ও অর্থের ব্যবহারকে একইভাবে

নিজের রচনায় অন্তর্ভুক্ত করাই সাধারণভাবে কাব্যহরণ নামে পরিচিত। রাজশেখরের ভাষায়—"পরপ্রযুক্তয়োঃ শব্দার্থয়োরুপনিবন্ধো হরণম্।" এই হরণকে রাজশেখর দু ভাগে ভাগ করেছেন—পরিত্যাজ্য ও অনুগ্রাহ্য। অর্থাৎ একধরণের হরণকে সব সময়েই পরিত্যাগ করা উচিত, তা না হলে হরণকর্তা কবির অপযশ হয়। দ্বিতীয় প্রকারের হরণে কোন দোষ নেই এবং এই প্রকারের হরণ পণ্ডিতদের দ্বারা অনুমোদিত। শব্দহরণ প্রণালীকে রাজশেখর পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন—

(ক) পদহরণ, অর্থাৎ কোনও কবিতা থেকে শুধুমাত্র শব্দহরণ।
(খ) পাদহরণ অর্থাৎ কবিতার একটি মাত্র চরণ অপহরণ।
(গ) অর্দ্ধহরণ অর্থাৎ কোনও কবিতার অর্দ্ধাংশ চুরি।
(ঘ) বৃত্তহরণ অর্থাৎ কোনও কবিতার বিশেষ ছন্দ চুরি করে কাব্য রচনা।
(ঙ) প্রবন্ধহরণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ কবিতাটিই হরণ

কোনও কোনও সাহিত্য-সমালোচক বলেন—কেবলমাত্র একটি পদচুরি তেমন অপরাধের নয়। রাজশেখর মনে করেন, একটি মাত্র পদচুরি দোষের নয় ঠিকই, কিন্তু সেই পদটি যদি দ্ব্যর্থক হয় তবে সেটির হরণ দোষের।

যদিও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে রাজশেখর কাব্যহরণকে তেমন নিন্দনীয় নয় বলে মনে করেন, তবে সাধারণভাবে কাব্যহরণ ব্যাপারটিকে খুব সুনজরে দেখেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রচলিত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—"পুংসঃ কালাতিপাতেন চৌর্যমন্যদ্ বিশীর্যতি।
অপি পুত্রেষু পৌত্রেষু বাক্চৌর্যং চ ন শীর্যতি ॥"

—কাল অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্যান্য সকল রকমের চৌর্যের কথা লোকে ভুলে যায়। কিন্তু কাব্যচুরি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অপহরণকারী কবির দুর্নামের কারণ হয়ে থাকে।

রাজশেখর অবশ্য মনে করেন যে, কয়েকটি কারণ বর্তমানে কাব্যহরণ তেমন দোষের হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর প্রতিভাময়ী বিদুষী পত্নী অবন্তীসুন্দরীর একটি মনোজ্ঞ উক্তি উপস্থাপিত করেছেন—"অয়ম্ অপ্রসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধিমান্ অহং, অয়ম্ অপ্রতিষ্ঠঃ প্রতিষ্ঠাবান্ অহম্, অপক্রান্তম্ ইদম্ অস্য সংবিধানকং প্রক্রান্তং মম, গুড়ূচীবচনোঽয়ং মৃদ্বীকাবচনোঽহম্, অনাদৃতভাষাবিশেষোঽয়ম্ অহমাদৃতভাষাবিশেষঃ, প্রশান্তজ্ঞাতৃকামিদম্, দেশান্তরিতকর্তৃকমিদম্, উৎসন্ন নিবন্ধনমূলমিদম্, ম্লেচ্ছিত-কোপানিবন্ধনমূলমিক্ ইত্যেবমাদিভিঃ কারণৈঃ শব্দহরণে অর্থহরণে বা অভিরমেত ইতি অবন্তীসুন্দরী। (কাব্যমীমাংসা, একাদশ অধ্যায়)।

—অবন্তীসুন্দরীর মতে নিম্নলিখিত কারণে শব্দহরণ ও অর্থহরণ দোষের নয় : এই কবি তেমন পরিচিত নয়, কিন্তু আমি খ্যাতিমান ও সুপরিচিত, অতএব এঁর কাব্য থেকে কিছু হরণ করা দোষের নয় ; এই রকম, এই কবি তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন নি, কিন্তু আমি প্রতিষ্ঠিত ; এই কবির রচনা তেমন প্রচলিত নয়, কিন্তু আমার রচনা প্রচলিত ; এই কবির ভাষা গুড়ূচীলতা বা গুলঞ্চ-লতার মতো, কিন্তু আমার ভাষা আঙুর রসের মত ; এই কবির ভাষা জনসমাজে অনাদৃত, কিন্তু আমার ভাষা অতি আদৃত ; এই কবির কাব্যের সাথে যাঁরা সাক্ষাৎ পরিচিত ছিলেন, তাঁরা আজ মৃত ; এই কাব্যের রচয়িতা দেশত্যাগী ; এই কাব্যের আদর্শ বর্তমান সময়ে গ্রহণীয় নয় ; এই কাব্যের

মূল অংশ ম্লেচ্ছ ভাষায় রচিত। অতএব এই সব কারণে উপরি উল্লিখিত কবিদের কাব্য থেকে শব্দার্থকে স্বকার্যের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

রাজশেখরের কোনও এক বিরুদ্ধবাদীর মতে—শ্লেষহীন তিনটির বেশী পদ পর পর কোন রচনা থেকে গ্রহণ করলে তাকে কাব্যহরণ পর্যায়ে ফেলা হয়। কিন্তু রাজশেখরের এ মত স্বাভিপ্রেত নয়। তিনি মনে করেন, যে পদরচনায় কবির স্বকীয় প্রতিভা প্রযুক্ত হয়েছে, সেই সব পদ অন্য কবি নিজের রচনায় প্রয়োগ করলে অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। তাছাড়া সহজেই প্রাচীন কোনও কবির রচনা বলে চিনতে পারা যায় এমন রচনা গ্রহণ করাও দোষের।

রাজশেখর অন্য এক আচার্যের উক্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "পাদ এবাহন্যথান্ব-করণকারণং ন হরণম্।" অর্থাৎ কোনও কবির রচনার একটি অংশকে কারণরূপে গ্রহণ করে যদি অন্য কবি কবিতা রচনা করেন তবে তাতে দোষের হয় না, একে শুধুমাত্র উদ্ধৃতিরূপে গণ্য করা চলে। উদাহরণ—"ত্যাগাধিকাঃ স্বর্গমুপাশ্রয়ন্তে ত্যাগেন হীনাঃ নরকং ব্রজন্তি।

ন ত্যাগিনাং কিঞ্চিদসাধ্যমস্তি ত্যাগো হি সর্বব্যসনানি হন্তি ॥"

অর্থ—যাঁরা বহু পরিমাণে দান করেন তাঁরা স্বর্গে গমন করেন, যাঁরা দান করে না, তাঁরা নরকে বাস করেন। দান যাঁরা করেন তাঁদের দুর্লভ কিছুই নাই। দান ও ত্যাগের দ্বারা সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

এই কবিতাটির শেষ চরণকে কারণরূপে গ্রহণ করে, অন্য কোনও কবি লিখেছেন—

"ত্যাগো হি সর্বব্যসনানি হন্তীতলীকমেতদ্ ভুবি সম্প্রতীতম্।

জানানি সর্বব্যসনানি তস্মাত্ত্যাগেন মে মুগ্ধবিলোচনায়াঃ ॥

অর্থ—ত্যাগের দ্বারা সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় এই কথা আজ পৃথিবীতে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। কারণ, সুলোচনা সেই প্রিয়াকে ত্যাগ করে আমার বিপদের শেষ নেই।

যে আলংকারিক পূর্ববর্তী কোনও শ্লোকের একটি চরণকে কারণরূপে নিয়ে এই রকম শ্লোক রচনাকে দোষের বলে মনে করেন না, রাজশেখর তাঁর সাথে একমত নন। রাজশেখর মনে করেন, এই ব্যাপারটি উদ্ধৃতির নামে কাব্যহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।—"তদিদং স্বীকরণাপরনামধেয়ং হরণমেব ॥" কোনও প্রসিদ্ধ কবির রচনার অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করা বা তাঁর কবিতার কোনও অংশের ঈষৎ পরিবর্তিত প্রয়োগও রাজশেখরের মতে দোষাবহ। কোনও অখ্যাত কবির উৎকৃষ্ট রচনা-মূল্য দিয়ে কিনে নিজের নামে প্রচার করাও কাব্যহরণের মধ্যে গণ্য।—'মূল্যক্রয়োহপি হরণমেব।" এতে কলঙ্কের মাত্রাই বাড়ে। অপযশ হওয়ার চাইতে যশ না হওয়া অনেক ভালো—"বরমপ্রাপ্তি র্যশসো ন পুনর্দুর্যশঃ।"

প্রাচীন কবিদের কাব্য থেকে অর্থ ও পদ গ্রহণ করার যৌক্তিকতা দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন (রাজশেখর তাঁর গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের সূচনায় এই মতগুলি উল্লেখ করেছেন) যে, প্রাচীন কবিদের রচনায় এমন অনেক তথ্য থাকতে পারে যা সম্পৎশালী ও নূতনত্বে ভাস্বর। তাই সেই সব কবিদের রচনা থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ উদ্ধার করার দিকে নবীন কবিদের যত্নশীল হওয়া উচিত। এই অভিমত রাজশেখরের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয় না। তিনি বলেন, জগতে কাব্যের উপকরণের কোনও অভাব কোনদিন হয় না। কারণ, প্রাচীনযুগ থেকে নিত্যনূতন উপাদানের আবির্ভাব হচ্ছে।

বাক্‌পতিরাজ বিরচিত 'গৌড়বহো' গ্রন্থের একটি উক্তি রাজশেখর এই প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন।—

"আসংসারমুদারৈঃ কবিভিঃ প্রতিদিন-গৃহীতসারোহপি।

অদ্যাপ্যভিন্নমুদ্রো বিভাতি বাচাং পরিস্পন্দঃ ॥"

—"সৃষ্টির আদিযুগ হইতে শ্রেষ্ঠ কবিগণ প্রতিদিন এই বাণীর ধারা হইতে মণিমুক্তা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। তবুও সেই বাঙ্ময়ের অবিরাম ধারাকে কেহ শেষ চিহ্নে চিহ্নিত করিতে পারেন নাই।"

তাই রাজশেখরের মতে, কবিদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, পূর্ববর্তী কবিরা যে পথ অবলম্বন করেন নি, সেই পথে দৃষ্টি রেখে "মুণিমুক্তা" আহরণ করা। তিনি বলেন, প্রতিভাবান কবিদের এক প্রকার সারস্বত দৃষ্টি থাকে এবং বাক্য ও মনের অতীত এক শক্তি থাকে, যার দ্বারা তিনি নিজের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়সমূহ আবিষ্কার করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রাচীন উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—সুপ্তস্যাপি মহাকবেঃ শব্দার্থৌ সরস্বতী দর্শয়তি। তদিতরস্য তত্র জাগ্রতোহপন্ধং চক্ষুঃ। অন্যদৃষ্টচরে হ্যর্থে মহাকবয়ো জাত্যন্ধাঃ। তদ্বিপরীতে তু দিব্যদৃশঃ। ন তৎ ত্র্যক্ষঃ সহস্রাক্ষো বা যচ্চর্মচক্ষুষোহপি কবয়ঃ পশ্যন্তি। মতিদর্পণে কবীনাং বিশ্বং প্রতিফলতি। কথং নু বয়ং দৃশ্যামহ ইতি মহাত্মনামহং-পূর্বিকয়ৈব শব্দার্থাঃ পুরো ধাবন্তি।"

অর্থ—মহাকবি সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও সরস্বতী তাঁর মধ্যে কাব্যনির্মাণের উপযোগী শব্দ ও অর্থের জ্ঞান দান করেন। যাঁদের মধ্যে কবিত্বশক্তি নেই, তাঁরা জেগে থাকলেও ঐ সব শব্দ ও অর্থ উপলব্ধি করেন না,—তাঁদের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। অন্য কবির রচিত শব্দে ও অর্থে বা বিষয়বস্তুতে মহাকবিরা জন্মান্ধের মত ব্যবহার করেন অর্থাৎ ভুলেও দৃষ্টি দেন না। কিন্তু অন্য কবির অনাচরিত বিষয়ের প্রতি তাঁদের দিব্যদৃষ্টি বর্তমান থাকে। সাধারণ দৃষ্টি নিয়ে মহাকবিরা যা উপলব্ধি করেন, তা মহাদেব বা ইন্দ্র একাধিক চোখ নিয়েও অনুভব করতে পারেন না। কবিদের মনোদর্পণে সমগ্র বিশ্ব প্রতিফলিত হয়। "কি করে আমরা কবিদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হব?"—এই রকম ইচ্ছা প্রণোদিত হয়েই যেন শব্দ ও অর্থ প্রতিযোগিতার ভাব নিয়েই মহাকবিদের সামনে ছোটাছুটি করে।

কাব্যহরণের নানাপ্রকার ভেদ আলোচনা প্রসঙ্গে রাজশেখর ধ্বন্যালোকরচয়িতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের বিষয়বস্তুর কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যেমন, প্রতিবিম্বকল্প, আলেখ্য-প্রখ্য, তুল্যদেহিতুল্য প্রভৃতি। যেখানে মূল ও হৃত কাব্যবস্তু সম্পূর্ণ এক, কিন্তু রচনাভঙ্গী ভিন্ন, সেখানে প্রতিবিম্বকল্প কাব্যের বিষয়। যেখানে সামান্য কিছু পরিবর্তন করে অন্য কাব্যের বিষয়কে জনসমক্ষে নিজের কাব্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়, তাকে বলে আলেখ্যপ্রখ্য কাব্য। যেখানে বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু রচনাসাদৃশ্যের জন্য দুটি কাব্যকে একরকম বলে ভ্রম হয় তাকে বলা হয় তুল্য-দেহিতুল্য। এই রকম অনেক কাব্যভেদ দেখানো হয়েছে এবং প্রত্যেক ভেদের সুপ্রযুক্ত উদাহরণ উপস্থাপিত করা হয়েছে।

কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রকারভেদের মধ্যে একটি কাব্যহরণের নাম 'ব্যস্তক'। যখন কোনও কবি অন্য কবির কাব্যের বিষয়বস্তু ভাব হুবহু গ্রহণ করে কেবলমাত্র ক্রম পরিবর্তন করে উপস্থাপিত করেন তাকে 'ব্যস্তক' বলে অভিহিত করা হয়। যেমন, কোনও করিরাজ অন্য একটি হাতী দেখে দড়ির বাঁধন

ছিঁড়ে, মাহুতের শাসন অমান্য ক'রে সামনে এগিয়ে যেতে উদ্যত হ'লে, করিণীর নিষেধ-ইঙ্গিতে নিবৃত্ত হল। কারণ, "প্রেম্না তুল্যং বন্ধনং নাস্তি জন্তোঃ—প্রাণীদের কাছে প্রেমের তুল্য বাঁধন নেই। এই কবিতার ভাবটির পৌর্বাপর্য পরিবর্তন ক'রে কোনও কবি লিখলেন—

"নির্বিবেকমনসোঽপি জন্তোঃ প্রেমবন্ধনমশৃঙ্খলদাম।
যৎপ্রতি প্রতিগজং গজরাজঃ প্রস্থিতশ্চিরমধারি করিণ্যাঃ

এই কবিতার ভাব একই। কেবল হাতীর ব্যাপারটি পরের ছত্রে বর্ণিত হয়েছে।

বিস্তারিতভাবে বর্ণিত কোনও কাব্যের অর্ধাংশ গ্রহণ করে রচিত কাব্যের নাম 'খণ্ড'। আবার সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত কোনও বিষয়কে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করার নাম 'তৈলবিন্দু'। এক ভাষায় রচিতং কবিতা অন্য কর্তৃক ভাষান্তরে রূপান্তরিত হ'লে তাকে বলা হয় 'নটনেপথ্য'।—"অন্যতমভাষানিবদ্ধ ভাষান্তরেণ পরিবর্ত্যতে ইতি নটনেপথ্যম্।" প্রাকৃতভাষায় রচিত একটি কবিতার সংস্কৃতে রূপায়ণের মাধ্যমে এই ভেদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।', এছাড়া আরও অনেক সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম অবান্তর কাব্যহরণের প্রকারভেদ নির্ণয় করা হয়েছে যার বিস্তৃত আলোচনা ক্ষুদ্র পরিসরে অসম্ভব ও নিষ্প্রোয়জন। কাব্যহরণে উৎসাহী কবিদের শ্রেণী নির্দেশ করেছেন রাজশেখর—

উৎপাদকঃ কবিঃ কশ্চিৎ কশ্চিচ্চ পরিবর্তকঃ।
আচ্ছাদকস্তথা চান্যস্তথা সংবর্গকোঽপরঃ॥
শব্দার্থোক্তিষু যঃ পশ্যেদিহ কিঞ্চন নূতনম্।
উল্লিখেৎ কিঞ্চন প্রাচ্যং মন্যতাং স মহাকবিঃ॥

—কোনও কবি নিজের প্রতিভার সাহায্যে কাব্যনির্মাণ করেন। কোনও কবি আবার অন্যের রচিত কাব্যের বিষয়বস্তুকে পরিবর্তিত করে নিজের কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর এক শ্রেণীর কবি অপরের কাব্য খুব নিপুণতার সাথে আত্মসাৎ করেন এবং নিজের কাব্যে ব্যবহার করেন। কিছু কবি আবার অন্যের সমগ্র কাব্যটিকে নিজের রচিত কাব্য বলে প্রচার করেন। কিন্তু যিনি বাঙ্ময় জগতে নূতন কিছু দেখতে পান এবং স্বীয় অনির্বচনীয় প্রতিভাবলে নিজের কাব্যে অলৌকিক কোনও বিষয়ের অবতারণা করেন, তিনিই হলেন মহাকবি।

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, রাজশেখর কাব্যহরণ ব্যাপারটিকে একেবারে বাস্তব সত্য বলে স্বীকার করেই 'মহাকবি'কে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষের দিকে রাজশেখর 'কবি' নামের অধিকারীকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—লৌকিক ও অলৌকিক। এই লৌকিক কবি আবার চার রকমের। ভ্রামকশ্চুম্বকঃ কিঞ্চ কর্ষকো দ্রাবকশ্চ সঃ।

স কবি লৌকিকোঽন্যস্তু চিন্তামণিরলৌকিকঃ॥

ভ্রামক, চুম্বক; কর্ষক ও দ্রাবক—লৌকিক কবি এই চার রকমের। এঁদের মধ্যে যিনি কোনও অপ্রসিদ্ধ কাব্যকে নিজ কবিকৃতির মাধ্যমে নূতনত্বের স্পর্শ দিয়ে পাঠককে বিভ্রান্ত করেন, তিনিই ভ্রামক কবি। নিজের আপাতরম্য কাব্যরচনার দ্বারা অন্য কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে যিনি সামান্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেন, তিনিই চুম্বক কবি। যে কবি কৌশলে অন্য কবির বাক্য ও অর্থ নিপুণভাবে প্রয়োগ ক'রে স্বকাব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেন, তিনিই হলেন কর্ষক কবি! আর যে কবি কোনও প্রাচীন

কবির কাব্যের মূল বিষয়বস্তু নিজের রচনার মধ্যে এমন নিপুণতার সাথে সংযোজিত করে দেন যে আপাতদৃষ্টিতে এটিকে প্রাচীন রচনা বলে মনে হয় না, তিনিই হলেন দ্রাবক কবি।

'অলৌকিক' কবিকে রাজশেখর 'চিন্তামণি' কবি আখ্যা দিয়াছেন। তিনি এই কবির সংজ্ঞা দিয়েছেন— চিন্তাসমং যস্য রসৈকসূতিরুদেতি চিত্রকৃতিরর্থসার্থঃ!

অদৃষ্টপূর্বো নিপুণৈঃ পুরাণৈঃ কবিঃ স চিন্তামণিদ্বিতীয়ঃ॥

—চিন্তামাত্রই যে কবির রসপূর্ণ ভাবসম্পদ্ ও অর্থনিচয় উপস্থিত হয় এবং যাঁর কাব্যসৌন্দর্য প্রাচীন নিপুণ কবিদের দ্বারাও আবিষ্কৃত হয়নি, তিনিই চিন্তামণি কবি। এই শ্রেণীর কবিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সাধারণভাবে কাব্যহরণ ব্যাপারটি রাজশেখরের অভিপ্রেত না হলেও, কাব্যরচনার ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করে তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে, এমন কোনও কবি নেই যিনি চোর নন এবং এমন কোনও বণিক নেই যিনিও চোর নন। তবে সেই লোকই অনিন্দার পাত্র হন যিনি নিগূঢ়ভাবে চৌর্যসম্পদ্ গোপন করতে পারেন।

"নাস্ত্যচৌরঃ কবিজনঃ নাস্ত্যচৌরো বণিগ্‌জনঃ।
স নন্দতি বিনা বাচ্যং যো জানাতি নিগূহিতুম্॥

এই প্রসঙ্গে জনৈক আলংকারিকের একটি সরস উক্তি স্মরণীয়—

"কবি রনুহরতি ছায়ামর্থং কুকবিঃ পাদাদিকং চৌরঃ!
সকল প্রবন্ধহর্ত্রে সাহসকর্ত্রে নমস্তস্মৈ॥"

—সাধারণ কবি পূর্ব কবিদের কাব্যের ছায়ামাত্র গ্রহণ করেন, কু-কবি অর্থ গ্রহণ করেন, কাব্যচোর শব্দ ও অর্থ উভয়ই গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই সাহসকর্তা যিনি সমগ্র কাব্যখানি হরণ করেন, তাঁকে নমস্কার।

কাব্যমীমাংসা গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ব্যাপী কাব্যহরণ প্রসঙ্গের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, রাজশেখরের সময়েই (নবম-দশম শতকে) কাব্যচৌর্য এমন ব্যাপকতা নিয়েছিল যে, তার জন্য রাজশেখরকে বিশদ পর্যালোচনায় অগ্রসর হতে হয়েছিল। আসলে কাব্যহরণ সর্বকালস্থায়ী বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অধ্যাপক' গল্পে এই প্রসঙ্গেই কৌতুকোদ্রিক্ত উল্লেখ করেছেন। এ গল্পে মহীন্দ্র রচিত একখানি নাটকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অধ্যাপক বামাচরণবাবু মন্তব্য করেছিলেন—"নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবং মূলভাবটি গেটে রচিত টাসো নাটকের অনুকরণ, এমন কি অনেক স্থলে অনুবাদ।" এই উক্তিতে ক্ষুব্ধ মহীন্দ্র সান্ত্বনা পেয়েছিল এই—"হউক অনুসরণ, কিন্তু সেটা নিন্দার বিষয় নহে। সাহিত্যরাজ্যে চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা, এমন কি ধরা পড়লেও। সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাজনগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন, এমন কি, সেক্সপিয়ারও বাদ যান না। সাহিত্যে যাহার অরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক সেই চুরি করিতে সাহস করে, কারণ, সে পরের জিনিষকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে পারে।"

বিস্মৃতপ্রায় মনীষী কালীকৃষ্ণ মিত্র

অজয়কুমার ঘোষ

আজকের কলকাতা-কেন্দ্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতির পাশে বারাসত একটি নগণ্য মহকুমার শহর মাত্র। কি গত শতকে এমনটি ছিল না। সেযুগে বারাসত ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এই উল্লেখযোগ্যতার মূলে প্রথমতঃ তিনজন মনীষীর নাম উল্লেখযোগ্যঃ কালীকৃষ্ণ মিত্র (১৮২২-১৮৯১)। তাঁর ভ্রাতা ডাঃ নবীনকৃষ্ণ মিত্র এবং শিক্ষাবিদ্ প্যারীচরণ সরকার। এছাড়া, বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের নামের সঙ্গেও বারাসত নামটি জড়িত। আজকের বারাসতের সাংস্কৃতিক হতশ্রী ও দৈন্যদশা দেখে মনেই হয় না গতশতকে এতগুলি মনীষী ব্যক্তির শুভ সম্মিলন এখানে ঘটেছিল।

এই নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে সকল কথা বলা সম্ভব নয়। কেবল বারাসতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কালীকৃষ্ণ মিত্রের জীবনকথা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক।

সেযুগে কালীকৃষ্ণকে অনেকেই 'মহর্ষি' ১ 'The Sage of Baraset' ২ 'A Modern Rishi' ৩ 'জ্ঞানাগার' ৪ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে উল্লেখ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে তাঁর নাম বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের নামের সঙ্গে একযোগে উল্লেখযোগ্য। এমন কি বেথুন স্কুল (১৮৪৯) প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণ সরকারের সহায়তায় বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় (১৮৪৭) প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই বাঙলাদেশের সর্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয়। কিন্তু এ সংবাদটি আজ আমরা অনেকেই ভুলে গেছি। তাই এ স্কুলটিকে সর্বাগ্রগণ্য বালিকা বিদ্যালয় হিসাবে স্বাধীনোত্তরকালে যে মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিল, কোন অজ্ঞাত কারণে তা দেওয়া হয়নি। সম্ভবতঃ কলকাতার উন্নতিতে আমাদের মনঃপ্রাণ নিবিষ্ট থাকতে এদিকে নজর পড়েনি।

জন্ম ও বংশপরিচয়ঃ ১৮২২ খৃঃ কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে কালীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শিবনারায়ণ মিত্র। এঁরা দর্জিপাড়ার মিত্র বংশীয় এবং সুপ্রসিদ্ধ 'ছাতুবাবু' বা আশুতোষ দেবের নিকট আত্মীয়। শিবনারায়ণের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণধন। হিন্দু স্কুলে অধ্যয়নকালে অল্প বয়সেই বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার জন্য এত খ্যাতিলাভ করেন যে Encyclopaedia Britanica-র বঙ্গানুবাদের দায়িত্বভার তাঁর ওপর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাত্র বিশ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে এটি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। রেভঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কৃষ্ণধনের সহাধ্যায়ী কৃষ্ণধনের মৃত্যুর পর তিনি Capt. D. L. Richardson সম্পাদিত 'Oriental Pearl' পত্রে এক শোকাত্মক কবিতা লিখেছিলেন 'K, D. M.' নামে।

শিবনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র স্বনামখ্যাত ডাঃ নবীনকৃষ্ণ মিত্র কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সর্বপ্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রথম স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত মেডিক্যাল ষ্টুডেন্ট। চিকিৎসক হিসাবে তিনি এত জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করেন যে লোকে তাঁকে 'ধন্বন্তরী' বলত। ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত নবীনকৃষ্ণ তেজস্বী, স্বাধীনচেতা ও নির্লোভ ছিলেন। একবার তিনি তাঁর

সহাধ্যায়ী কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের উপকার করেছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মহারাজ তাঁকে এক লক্ষ টাকা দিতে চান। নবীনকৃষ্ণ তা প্রত্যাখান করেন। এদেশে ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিক্ষাদানের জন্য তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

কালীকৃষ্ণ মিত্রঃ হিন্দুকলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র কালীকৃষ্ণের জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল অপরিসীম। সারাজীবন তিনি নানা বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থরাজি মন্থন করেছেন। কবি দীনবন্ধু মিত্র তাঁকে 'জ্ঞানাগার' আখ্যা দিয়েছেন। বারাসাতে বসে লোকচক্ষুর অন্তরালে সারাজীবন তিনি যে বিপুল জ্ঞানার্জন করেন তার তুলনা বিরল। তাঁর মৃত্যুর পর "Indian Mirror" পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, He was at his death, we believe, one of the most uptodate scholars of our country, keeping abreast of the latest contributions to human knowledge by an enthusiastic and unwearied application to books in more than one language.' ৫

কালীকৃষ্ণের জ্ঞানের পরিধি ছিল বিশাল। অনুসন্ধিৎসা ছিল সর্বতোমুখী। তবে উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা, নিদানশাস্ত্র ভৌতিক ও অতিপ্রাকৃতবিদ্যা, যোগশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র আলোচনাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল সর্বাধিক।

আধুনিক কৃষি-রসায়ন (Agricultural Chemistry) ও চিকিৎসাশাস্ত্রও তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন।

কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন তিনি জীবনের একটি মুখ্য ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্যে পাশ্চাত্য দেশ থেকে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আনিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কৃষিজীবীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ছিল বারাসতের নবীনকৃষ্ণ মিত্রের সুবিখ্যাত সুবিশাল উদ্যান। এই উদ্যানে তিনি একটি আদর্শ কৃষিভাণ্ডার বা Model Farm খুলেছিলেন। এই বাগানের ফল ও ফসল ছিল দেখবার মতো। এই উদ্যানে তিনি আবহ-বিদ্যা (Meteorology) সম্পর্কিত যন্ত্রাদিও স্থাপন করেছিলেন। এই উদ্যানের বর্তমানে অস্তিত্ব নেই। এর এক অংশের ওপর দিয়েই বারাসত রেলস্টেশন নির্মিত হয়েছে।৫ক

শেষজীবনে কালীকৃষ্ণ হোমিওপ্যথি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নে মনঃপ্রাণ নিয়োজিত করেন এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এত পুস্তক (লেখকের নাম কোনটিতে থাকতো না) রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন যে সেগুলো ছিল 'Hindu Patriot'-এর ভাষায় "....a moment of their author's learning and industry." ৬

বারাসতে Truth Seekers' Reading Club নামে এক সভা স্থাপন তাঁর আর একটি অন্যতম কীর্তি। এখানে নিয়মিত যোগশাস্ত্র ও অধ্যাত্মবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা হ'ত। এ বিষয়ে তিনি এত গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন যে 'Theosophist পত্রিকার মতে—"he left one of the best and most complete libraries of occult liierature."৭ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলামীয়—কোন ধর্মশাস্ত্রই তাঁর অপঠিত ছিল না। তিনি পাণ্ডিত্যের কোন স্থায়ী নিদর্শন তিনি রেখে

যেতে পারেননি। কারণ পরদুঃখ নিবারণই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাই গ্রন্থরচনার চেয়ে কৃষকদের চাষের উন্নতির বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষালাভ, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, আর্ত ও পীড়িতের চিকিৎসাতেই তিনি জীবন ব্যয় করেছেন। নবকৃষ্ণ ঘোষের ভাষায় তাঁর জীবন "কায়মনোবাক্যে একটি পরার্থপরতার ইতিহাস।" ৮

প্রচলিত অর্থে গ্রন্থকার না হ'লেও তাঁর লেখনীর বিরাম ছিল না। তিনি যা কিছু লিখেছেন তা' সমাজের দরিদ্রকল্যাণের জন্য এবং ইংরেজী ও বাঙলা ভাষায় লেখা তাঁর সব রচনাই বিনা-নামে প্রকাশিত।

যশোলিপ্সা বা নিজের বৈষয়িক উন্নতি-চিন্তা তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। তিনি ছিলেন নিরহংকার, নির্লোভ, আত্মপ্রচারবিমুখ, ও ভক্তের প্রশংসায় কুণ্ঠিত ও সংকোচিত। তাঁকে 'বড়' বললে বড ব্যথা পেতেন। তাঁর একটা ফটো তোলার প্রস্তাবেও কোনদিন তিনি সায় দেননি। একটিমাত্র ফটোই আছে। সেটি মৃত্যুর পর তোলা।৯

কালীকৃষ্ণ দেখতেও ছিলেন অতি সাধারিধে। বিদ্যাসাগরকে অনেকে 'উড়ে' বলে মনে করতেন। একথা তাঁর জীবনীতে আছে। কালীকৃষ্ণকেও একবার একদল সিপাহী বাগানের মালী বলে ভুল করেছিল। একথা জানিয়েছেন রমেশচন্দ্র বসু নামে জনৈক ব্যক্তি। কালীকৃষ্ণ তাঁর উদ্যানে কাজ করছিলেন। একদল সিপাহী তাঁকে কাছারীর পথ দেখাতে বলে। কালীকৃষ্ণ হাত তুলে পথ দেখিয়ে দেন। তাতে তারা সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁকে হাত ধরে জোর করে টানতে টানতে আদালত পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যায়। তাঁকে দেখেই তৎকালীন মহকুমা-শাসক সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে উঠে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন এবং সিপাহীদের জরিমানা করতে উদ্যত হন। কালীকৃষ্ণের হস্তক্ষেপে সেযাত্রা শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পায়। পরে তারা কালীকৃষ্ণের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আর একবার কলীকৃষ্ণের বাগানে এক লেবুচোর ধরা পড়ল। কালীকৃষ্ণ তাকে মধুর স্বরে বললেন, "তোমার যদি লেবু খাবার ইচ্ছা হয় আমাকে বললে না কেন? না বলে পরের দ্রব্য নিলে অপহরণ করা হয় তাও কি জান না?"।

হিন্দুকলেজের পাঠ সাঙ্গ করে আনুমানিক ২০ বছর বয়সে (১৮৪২) কালীকৃষ্ণ নবীনকৃষ্ণ-সহ সপরিবারে বারাসতে বাস করতে আসেন এবং জীবনের বাকি দিনগুলো অর্থাৎ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বারাসতেই কাটান। বারাসতে তাঁদের যে মাতুলাশ্রম ছিল সেখানেই তাঁরা উদ্যান ও বসতবাড়ী নির্মাণ করেন।

কালীকৃষ্ণ চিরদিন ক্ষীণকায় ও অসুস্থ ছিলেন। জীবিকার জন্য কোনদিন তাঁকে পরের দাসত্ব করতে হয়নি। অগ্রজ নবীনকৃষ্ণ তাঁকে অর্থোপার্জনের জন্য কোন চেষ্টাই করতে দেননি। তিনি ডাক্তারী করে প্রচুর অর্থোপার্জন করতেন এবং অর্থ কালীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতেন। জানতেন যে অর্থের অসদ্ব্যবহার হবে না। কালীকৃষ্ণের নিজের প্রয়োজন ছিল অতি সামান্য। একখানি বিলাতী অল্প মূল্যের কাপড়, চটীজুতা ও শীতকালে একখানি বালাপোষ হইলেই তাঁহার বেশভূষা সম্পন্ন হইত, আরদীনদরিদ্রগণের ক্ষুন্নিবারণের উপযোগী আহারীয় হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন—তিনি যৌবনকাল হইতেই নিরামিষভোজী ছিলেন। টাকাপয়সা রাখিবার জন্য তাঁহার

বিলাতী purse বা মণিব্যাগের প্রয়োজন হইত না। একটি দেশলাইয়ের বাক্স হইলেই চলিত; এবং অধ্যয়ন বা লিখনের জন্য তিনি চেয়ার-টেবিল-সজ্জিত পাঠাগার অপেক্ষা বৃক্ষতলে স্থাপিত একখানি সামান্য কাষ্ঠাসন অধিকতর পছন্দ করিতেন।"১১ তাঁর মৃত্যুর পর Hindu Patriot লিখল, "Extremely simple and abstemious in his habits, he strongly reminded one of Wordsworth's 'wanderers' and his life was continuous self-sacrifice in word and thought and deed."১২

কালীকৃষ্ণ সভাসমিতি, জাঁকজমক, জনকোলাহল ইত্যাদি মোটেই ভালোবাসতেন না। বারাসতের পল্লী-নিবাস ছেড়ে বিশেষ কোথাও যেতে চাইতেন না। একবার তিনি কৃষ্ণনগরে এসে রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ কৃষ্ণনাগরিক নব্যবঙ্গীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণনগরের দেড় ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণে আনন্দবাগ নামক উপবনে বনভোজনে যোগ দিয়েছিলেন; ফেরবার সময় নৌকাপথে তাঁদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রস্তাবনা হয়েছিল বলে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিতে ১৩ এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে ১৪ উল্লেখ করা হয়েছে। বেশির ভাগ সময় তিনি বারাসতেই কাটিয়েছেন। মাঝে মাঝে কোন বিদেশী পাদ্রী বা কোন গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন লোকসেবা, উদ্যানর্চা ও জ্ঞানচর্চাতেই তাঁর দিন কাটত। প্রতিদিন সকালে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে তাঁর কাছে শত শত দরিদ্র ব্যক্তি আসতেন। তিনি তাঁদের রোগে ঔষধ-পথ্য, শোকে সান্ত্বনা, অভাবে অন্নবস্ত্র অকাতরে দান করতেন। 'নীলদর্পণ'-কার দীনবন্ধু তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে যথার্থই বলেছেন—

"জ্ঞানাগার কালীকৃষ্ণ স্বভাব-বিনত।
বারাসতে প্রাণরক্ষা করে শত শত।।" ১৫

বারাসতে কোন পথিক বা আগন্তুক এলেই লোকে তাঁকে সর্বাগ্রে কালীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যেত।

১৮৪৬ খ্রী: 'কাষ্ট বুক'-খ্যাত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ প্যারীচরণ সরকার গভর্নমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে বারাসতে এলেন। কালীকৃষ্ণ ও নবীনকৃষ্ণের সঙ্গে অচিরেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠ্‌লো।

এই তিনজন মনীষী ও বারাসতের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) চার্লস্ বিনি ট্রেবর সাহেবের উৎসাহে তৎকালে বারাসতের যে উন্নতি হয়েছিল তা আর কখনও হয়নি। বারাসত স্কুল বাঙলাদেশে প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় রূপে গণ্য হয়, সেই সময়েই বারাসতে সর্বপ্রথম কৃষি-বিদ্যালয় (Agricultural School), শ্রমজীবিগণের বিদ্যালয় (Industrial School) এবং বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমস্তই প্যারীচরণের কীর্তি এবং এই সব ব্যাপারে কালীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। ১৫ক

স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তার: এই সময়কার বারাসতের একটি মস্ত বড়ো ঘটনা হ'ল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। তখনও বেথুন স্কুল (১৮৪৯) প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার আগেই ১৮৪৭ সনে বারাসতে যে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল সেটিই বাঙলাদেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পূর্বোক্ত তিন মনীষীকে অশেষ নিন্দা, গ্লানি ও সামাজিক পীড়ন সহ্য করতে হয়। ১৬

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা সংকল্পে ছিলেন অটুট। কর্মে অক্লান্তোদ্যম। ট্রেবর ও জ্যাকসন সাহেব তাঁদের প্রভূত উপকার করেছেন।

কয়েক বছর পরে বঙ্গের শিক্ষক-সভা ও সরকার তাঁদের বাঙলাদেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়-স্থাপয়িতা ব'লে অভিনন্দিত করেন ও উৎসাহ দেন। ১৭ বেথুন সাহেব ও স্যার জেম্‌স্ কল্‌ভিন্ বারাসতে এসে এই স্কুল পরিদর্শন করে যান।

নবীনকৃষ্ণের বাড়ীতে প্রথম এই স্কুল বসে। নবীনকৃষ্ণের কন্যা কুন্তীবালই (অন্নানাম স্বর্ণলতা) এই স্কুলের প্রথম ছাত্রী এবং শ্রেষ্ঠ ছাত্রী। প্রথমে বারাসতের অনেকেই এই স্কুলে মেয়ে দিতে রাজি হননি। কিন্তু যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে স্বয়ং নির্মলচরিত্র কালীকৃষ্ণ শিক্ষকতা করবেন, তখন বহু অভিভাবক তাঁদের মেয়ে ভর্তি করে দিলেন।

১৮৫৪ সনে প্যারীচরণ কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (পরে হেয়ার স্কুল নামে খ্যাত) বদলী হয়ে গেলে কালীকৃষ্ণ বারাসতে কৃষি ও শিল্পবিদ্যালয় দুটি বিস্তৃত আকারে নিজ উদ্যানে সংলগ্ন করে চালাতে লাগলেন। তখন থেকেই তিনি এই উদ্যানে বসতবাড়ী নির্মাণ করে সপরিবারে বাস করতে থাকেন।

প্রায় দেড়শতাধিক বিঘা জুড়ে এই উদ্যান নির্মাণে জীবনকৃষ্ণের প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছিল। অতি দুষ্প্রাপ্য নানা দেশী-বিদেশী ফুল-ফল গাছের এমন সমাবেশ আর কোথাও ছিল না। এদিকে এটি ছিল দেশী-বিদেশী, শিল্পানুরাগীদের দ্রষ্টব্যস্থল, আবার অন্যদিকে ছিল আদর্শ কৃষিভাণ্ডার কৃষিশিক্ষাকেন্দ্র। সর্বোপরি এটি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছিল মহাত্মা কালীকৃষ্ণের আশ্রম ব'লে। এই পরম রমণীয় উদ্যানে কালীকৃষ্ণ কর্মনিরত থেকে শান্তিময় জীবন যাপন করতেন। বন্ধু প্যারীচরণ সময় পেলেই কলকাতা থেকে চ'লে আসতেন। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরও আসতেন।

নবীনকৃষ্ণ ডাক্তারী করতেন কলকাতার ঝামাপুকুর লেনে। সেখানেও প্যারীচরণ, কালীকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর প্রায়ই মিলিত হ'তেন। বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ আন্দোলনের' এবং প্যারীচরণের 'মদ্যপাননিবারণী সভা'-র কালীকৃষ্ণ ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। প্যারীচরণ-সম্পাদিত 'well wisher' ছাড়াও 'হিতসাধক' ও 'এডুকেশন গেজেটের' কালীকৃষ্ণ ছিলেন প্রধান লেখক। এই পত্রিকাগুলির 'বিধবা-বিবাহ', 'কৃষিবিদ্যা', 'স্ত্রী-শিক্ষা', 'মাদক-নিবারণ' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ কালীকৃষ্ণের লেখা বলে নবকৃষ্ণ ঘোষ জানিয়েছেন।

প্যারীচরণ ও বিদ্যাসাগর তাঁদের শিক্ষা-সম্পর্কিত পুস্তক রচনা বিষয়ে বন্ধু কালীকৃষ্ণের মতামত মূল্যবান জ্ঞান করতেন। শেষজীবনে ভ্রাতুষ্পুত্রী কুন্তীবালার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে অবস্থানকালে কালীকৃষ্ণের কাছে অনেক মনীষী ব্যক্তি আসতেন। রামতনু লাহিড়ী তাঁদের অন্যতম।

কালীকৃষ্ণের জীবন-মধ্যাহ্নে ১৮৬০ খ্রীঃ ভ্রাতা নবীনকৃষ্ণের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে কালীকৃষ্ণ অকূল পাথারে পড়লেন। অর্থাগমের পথ বন্ধ হল অথচ দায়িত্বভার সবই রইল। সেই বিপদের দিনে বন্ধু প্যারীচরণ ও বিদ্যাসাগর অযাচিত ভাবে, স্বেচ্ছায় বহু ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। বছর খানেক পরে নবীনকৃষ্ণের জামাতা কালীচরণ এই ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কালীচরণের স্ত্রী কুন্তীবালা

(নবীনকৃষ্ণের কন্যা) কালীকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী হলেও কন্যাসম ছিলেন।

কালীকৃষ্ণ ছিলেন অনন্যসাধারণ নীতিবাদী ও সত্যনিষ্ঠ। "শ্যামাসুন্দরী দাসী বনাম কালীকৃষ্ণ মিত্র দিগর" বারাসতের উদ্যান সংক্রান্ত এক মামলা আলিপুর জজ-আদালতে হয়েছিল। অনেক প্রলোভন ও কুমন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে কালীকৃষ্ণ সত্য কথাই আদালতে ব্যক্ত করেন। তাঁর সত্যনিষ্ঠার আরেকটি উদাহরণ—আবাল্য প্রতিপালিত স্নেহাস্পদ এক তরুণ আত্মীয় কালীকৃষ্ণের পুত্রস্থানীয় ছিলেন। তার মা মারা গেলে সে ব্রাহ্ম-পদ্ধতিতে মাতৃশ্রাদ্ধ করতে চাইল। কারণ হিন্দু পদ্ধতিতে তার বিশ্বাস নেই। এতে কালীকৃষ্ণ মত দিলেন। ফলে পরিবারে দারুণ আলোড়ন ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। কালীকৃষ্ণ বললেন যে তিনি কপটাচারের সমর্থন করতে পারেন না। যে যুবককে তিনি আবাল্য সত্যনিষ্ঠ হতে শিক্ষা দিয়েছেন, তাকে কি ব'লে তার বিশ্বাসের প্রতিকূলে যেতে বলবেন?

সংসার-ত্যাগী না হ'য়েও কালীকৃষ্ণ ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁর ধর্মজ্ঞান ছিল উদার। তাঁর মুখে খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য শুনে খৃষ্টানগণ এবং বুদ্ধ-মাহাত্ম্য শুনে বৌদ্ধগণ তাঁকে নিজেদের লোক বলে মনে করতেন। আবার বারাসতের উদ্যানবাটিকার বৃক্ষতলে তাঁর শান্তসমাহিত মূর্তি দেখে ব্রাহ্মগণ তাঁকে ব্রাহ্ম এবং তাঁর মুখে থিয়োসফির কথা শুনে থিয়োসফিষ্টগণ তাঁকে নিজেদের দলের লোক ভাবতেন।

তাঁর চরিত্র-মহিমার কথা বলতে গিয়ে 'সঞ্জীবনী' লিখেছিল, "তাঁহার সহিত দুদণ্ড থাকিলে জীবন উন্নত পবিত্র হইয়া গেল বোধ হইত।" ১৮

"The Ephiphany" পত্রিকা লিখেছিল—"His life was more streking than his words, and his conversation always come short of depth and reality of his interior life and experience." ১৯

কালীকৃষ্ণ জীবনে সুখ-শান্তি বিশেষ পাননি। একে ত চিরদিন ভগ্নস্বাস্থ্য, তার ওপর নবীনকৃষ্ণ ও প্যারীচরণের মৃত্যু তাঁর কাছে মর্মান্তিক আঘাত নিয়ে এল। শুধু বিদ্যাসাগর ছিলেন বেঁচে। কালীচরণ ঘোষের মির্জাপুর ষ্ট্রীটের বাসায় কালীকৃষ্ণের শেষ-জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। বিদ্যাসাগর তখন খুবই অসুস্থ। পাল্‌কীতে চ'ড়ে এই বাড়ীতে তিনি কালীকৃষ্ণকে দেখতে আসতেন। দু'জনে বসে অনেক পুরোনো দিনের স্মৃতি-রোমন্থন করতেন। অবশেষে ১৮৯১ সনের ২রা অগাষ্ট প্রাতঃকালে ৭০ বছর বয়সে সহধর্মিণী ও দুই বিবাহিতা কন্যা রেখে কালীকৃষ্ণ মৃত্যুবরণ করেন। তার মাত্র ৪ দিন আগে (২৯ জুলাই, ১৮৯১) বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়।

কালীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর কৃতজ্ঞ বারাসতবাসী তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এক প্রস্তর-ফলক নির্মাণ করেন। বারাসত এ্যাসোসিয়েসনের হলঘরে অর্থাৎ 'ট্রেবর হলে'র উত্তর দিকের দেয়ালে সেটি আজও অবস্থিত। ফলকের কথাগুলি নীচে হুবহু উদ্ধৃত হ'ল।

This tablet
Sacred To The MEMORY Of The Late
Babu Kallykrishna Mittra
The sage of Barasat
The Father Of The Poor

The first leader in the cause of philanthrophic and educational reform
In This Part of the Country
The founder of the first Girls' School in Bengal
And the Pioneer Of Homoeopathy In The Baraset Sub-District
has been raised by the
Baraset Association
In reverend loving and mournful memory of his immortal services
Rendered Unceasingly During Half A Century
In the cause of people's well being
His Vast Erudition
His large sympathy in the cause of education for all
His Catholicity In Matters Religious And Social
His Selflessness And Charity
His Saintliness And Character
And the exalted Purity and simplicity of his life
Ever devoted to the ministry of good works
And His Many Private And Public Virtues
Not least amongst which was
His High-Souled Identification At Whatever Cost Of The Public
Interest With His Own.

Born 1822 A. D. "Aged 70 years" Died 1891 A. D.

উল্লেখপঞ্জী ও সূত্রনির্দেশ

(১) মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র/নবকৃষ্ণ ঘোষ/প্রদীপ/কার্তিক অগ্রহায়ণ/১৩০৮/পৃঃ ৩৮০, ৪১৩ (২) বারাসতবাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর-ফলক ("বারাসত এ্যাসোসিয়েশন গৃহে" দ্রঃ) (৩) Indian Mirror/16th August/1891 (নবকৃষ্ণ ঘোষের প্রবন্ধে উদ্ধৃত) (৪) স্বরধুনীকাব্য/দীনবন্ধু মিত্র/ রচনাসংগ্রহ/সাক্ষরতা/পৃঃ ৪৬৬ (৫) Indian Mirror/18th August/1991 (নবকৃষ্ণ ঘোষের প্রবন্ধে উদ্ধৃত) ৫ক দ্রঃ প্যারীচরণ সরকার/(জীবনবৃত্ত)/নবকৃষ্ণ ঘোষ/১৩০৯ পৃঃ ৭৬ (৬) Hindu Patriot/ 3rd August 1891, (নবকৃষ্ণ ঘোষের প্রবন্ধ উদ্ধৃত) (৭) Theosophist, October, 1891

নবকৃষ্ণ ঘোষের প্রবন্ধে উদ্ধৃত)।

(৮) মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র | নবকৃষ্ণ ঘোষ | প্রদীপ | কার্তিক-অগ্রহায়ণ | ১৩০৮

(৯) ঐ | ঐ ঐ | ঐ | ঐ

(১০) ঐ | ঐ ঐ | ঐ | ঐ পাদ টীকা ৫ঃ পৃঃ ৪১৮

(১১) ঐ | ঐ ঐ | ঐ |

(১২) Hindu Patrriot | 3rd August | 1891 | (নবকৃষ্ণ ঘোষ উদ্ধৃত)

(১৩) আত্মজীবন চরিত | দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়

১৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | শিবনাথ শাস্ত্রী | ৩য় সং—১৮৪-১৮৫

(১৫) স্বরধুনী কাব্য | দীনবন্ধু মিত্র | রচনা-সংগ্রহ | সাক্ষরতা | পৃঃ ৪৬৬

(১৫ ক) প্যারীচরণ সরকার | নবকৃষ্ণ ঘোষ | ১৩০৯ | পৃঃ ৪২—৭৮

(১৬) Freedom Movement in Bengal (1818—1904) Who' Who—N. Sinha | 1968 p. 161.

(১৭) General Report on Public Institution, Bengal, for 1849—1850 | pages 4—5

(১৮) সঞ্জীবনী | ২৪শে শ্রাবণ | ১২৯৮ ঐ (নবকৃষ্ণ ঘোষের প্রবন্ধে উদ্ধৃত)

(১৯) The Epiphany | 13th August | 1891 (ঐ)

অনুবাদ্যও সুবাদ্য ও সুপাচ্যই

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

অনুবাদ আধুনিক যুগেও অপরিহার্য। তবে কোনটা অনুবাদ্য এবং কিসের প্রয়োজনে; তা কিন্তু অবশ্যই বিচার্য।

তাই প্রথমেই চিন্তাসূত্রকে গ্রন্থিত করতে হবে প্রয়োজনের ভিত্তিমূলে।

ভাষান্তর। ভাব থেকে ভাবে, ভাষা থেকে ভাষায়।

একটি ভাষা থেকে অন্য একটি ভাষায় ভাব ও ভাবনাকে. চিন্তা ও চেতনাকে, আশা ও আশ্বাসকে মূর্ত করে তোলা। এবং যথাযথ ও যথার্থ ভাবেই তা সম্পন্ন করতে হলে যে ভাষা থেকে অপর যে ভাষায় রূপান্তর ঘটানো হচ্ছে, সেই উভয় ভাষাতেই যথেষ্ট অধিকার অর্জন করতে হয়েছে। বিশেষ বাকভঙ্গী, বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ শব্দের অর্থ-ঘোষণা প্রভৃতি উপলব্ধির অভিজ্ঞান সঞ্চয় অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

আর যে মানসিকতায় মৌল-রচনাকার বিচারশীল তার যথাযোগ্য পরিচায়িকাকে মনের দর্পণে রচনাদর্শ ও রচনাদর্শন রূপে প্রতিবিম্বিত রাখতে হয়েছে। প্রতিকৃতি অঙ্কনের আগে এ যেন প্রকৃত দেখা এবং প্রকৃতি দেখাও। শিল্পীর চোখে শিল্পায়ণে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বের জীবন্ত দেখার পর সেই পথ ধরে সেই জীবনায়ন। জীবন্ত অনুসরণ। তবে নিছক অনুকরণ না হলেই বাঁচি।

যে কোনো শিল্পকর্ম তাতো সৌন্দর্যসৃষ্টির নান্দনিক পথকে অনুসরণ করে চলে, এবং অনুসরণ করতে করতেই চলে। তবে রূপশিল্পী সৃজনশিল্পী বলেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং বিশেষ বিশেষ ধারার বিশিষ্টতা নিয়েই রূপকার। তাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর যামিনী রায়ের ছবি আলাদা আলাদা অথবা রাজপুত চিত্র আর কালীঘাটের পট আলাদা। যাঁর যেমন কলম অথবা লেখনী, তিনি তেমনি লিখছেন।

আজ পিকাসোকে দেখে বলা যাবে না কেন তিনি মাইকেল এঞ্জোলোর পথ অনুসরণ করলেন না? অথবা নন্দলাল বসুকে বলা যাবে না কেন তিনি সুনয়নী দেবীর ছবির মতো টানা চোখের প্রচলনটি করালেন না?

একজন আরেকজন মানুষ থেকে যেমন অভিন্ন যেহেতু মনুষ্যদেহধারী বলে কিন্তু আবার ভিন্নও। একজন মানুষ ঠিক অন্য আরেকজন মানুষের হুবহু একই আদল নয়; সে দেহের দিক থেকেও নয়, মনের দিক থেকেও নয়।

তবু একটা সমধর্মী সমসূত্র অবশ্যই আছে, থাকছে এবং থাকবে?

যে কোনো গ্রন্থপাঠের পর আমাদের সকলের মনেই কিছু-না-কিছু ভাবের আলোড়ন হয়। সে আলোড়নটা সত্যিই কিন্তু তার প্রকৃতিটা বা প্রকৃত স্বরূপটা কেমন যে তার অনুভূতিটা সকলের সমান কি? একজন গ্রন্থটির ভালো দিকটাকেই ভালো মনে মেনে নিলেন, মন্দ দিকটাকে এহবাহ্য বলে উড়িয়ে দিলেন। অপরজন শুধু মন্দ দিকটাকেই নিয়ে উত্তাল আটলান্টিক সমুদ্রের সৃষ্টি করলেন।

কিন্তু যিনি ভালো আর মন্দ সবটাই বলছেন, যিনি ভালোর মধ্যেও ভালোর মাত্রা বুঝছেন আর মন্দের মধ্যেও মন্দের সূত্র খুঁজছেন, তিনিই একটা সমধর্মী মনের বহুজনের সমীপবর্তী হতে পারেন। তাই দেখি বেশি ভালোও যেমন ঠিক ভালো নয়, বেশি মন্দ বলাও ভালো কি?

অনুবাদকের প্রথম কাজ তাই ভালোমন্দের বিচারবোধ থাকা। কোনটা মন্দ, কতটা মন্দ আর কোনটা ভালো কতটা ভালো। নির্বিবাদে অনুবাদে তাই হটকারিতা বললে প্রতিবাদ ঠিক করা যাবে কিনা সন্দেহ! অণু-পরমাণুর যুগে অনুবীক্ষণী দৃষ্টিই যথার্থ মনোদর্শন।

একজন ভদ্রলোকের দুটি কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যাটি বেশ বুদ্ধিমতী কিন্তু দৈহিক বৃদ্ধি নেই। ষোড়শীতেও যেন শিশুটি। চিকিৎসার আধুনিকতম প্রচেষ্টা ব্যর্থ। অথচ দ্বিতীয় কন্যার তিলে তিলে তিলোত্তমা রূপৈশ্বর্য। বিবাহ-যোগ তাই দ্রুতই হয়ে যায়। অথচ প্রথমা কন্যা অসুস্থ বলেই বিবাহ-অযোগ্যা হয়েই সে রয়েছে। কি উপায়? সকলেই মত দিলেন দ্বিতীয়ার সৎ-পাত্রে তো হাত ছাড়া করা যায় না, পাত্রস্থ করতেই হয়। কিন্তু পিতৃ হৃদয় হয় বেদনার্ত। প্রথমার মনে যে আঘাত লাগবে তা এক্ষেত্রে অনিবার্যই। দ্বিতীয়ার তাই দানসামগ্রী যখন ক্রয় করছেন, পিতৃহৃদয় উদারভাবে সহৃদয়তার সঙ্গে ক্রয় করতে থাকলে প্রথমারও হুবহু সমস্ত সামগ্রী; যেন একটু সুস্থ হলেই এইসব সামগ্রীসহ প্রথমারও বিবাহ হবে দ্বিতীয়ারই অনুরূপ। নিরাশার মধ্যে আশার আলো জ্বালানো অথবা ব্যর্থতার বিষবাষ্পরূপে সান্ত্বনার শান্তিজল!

কথাটা অনুবাদ ও অনুবাদক সূত্রে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে মনে আসছে এই জন্যে যে, এমন কতকগুলি ভাষা আছে যা প্রাচীন ও উন্নত। একদিন তার সাহিত্যমূল্য ও সাহিত্যিকমূল্য যথেষ্ট আদরের ও আজও সমাদরে শিক্ষার। কিন্তু তার প্রচলন আর নেই আজকের জীবন্ত জনগোষ্ঠীর ভাষা রূপে। চলতি কথায় যাকে বলা যায়—শীতলকক্ষেই শুধুমাত্র সীমিতক্ষেত্রে তারা কালের সাক্ষী।

তবে শিক্ষার জগতে বা শিক্ষিত মানসে তার উচ্চমান ও উন্নত মনন স্বীকার করে অবশ্যই অধীতবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়পঞ্জী হওয়া উচিত, হতেও হবে এবং হওয়ার জন্য দাবীও রাখতে হবে। কিন্তু সে শুধু প্রাচীন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আত্মোপলব্ধির জন্যে। কারণ প্রাচীন যে বিপুল সাহিত্য ও শাস্ত্রীয় বিদ্যা তা তো আধুনিকতম মানসকেও উপলব্ধি করা হবে। ওয়াকিবহাল করাতে হবে ফেলে আসা সুবর্ণসম্পদের ঐশ্বর্যকেও। কোনদিন ঐতিহ্যের সূত্রকে তো অস্বীকার করা চলে না, করার কথাই আসে না বা ওঠে না। বরং পদে পদে স্বাদু স্বাদু বলে সাধুবাদ দেওয়াই কর্তব্য দেশের যথার্থ যদি শাস্ত্রীয় সম্পদ প্রাচীন ভাষায় থাকে। এবং তা আছে বলেই সমৃদ্ধিতর আধুনিক ভাষার রূপ রীতি এবং রচনা। তার ধারায় ধারায়, তার শব্দ ও ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত ও অভিসিঞ্চিত মুখের ভাষা প্রকৃত ভাষার পথ পেরিয়েই পেয়েছে।

এই ধরনের যে সব প্রাচীন ঐশ্বর্যময় অচলিত ভাষা তা জ্ঞানের মার্গে বিজ্ঞানের মার্গে আর সাধনার তুরীয়লোকে সিদ্ধভাষা এবং সিদ্ধির ভাষা। অথবা বলা যায় সিদ্ধার্থ-সন্ধানী আশার সোপান। সমস্ত পুরান বা তন্ত্র, সমস্ত বেদ ও উপনিষদ, সমস্ত কালিদাস রচনাবলী, সমস্ত ভাস ভাষণাবলী, সমস্ত ভারতের নাট্যশাস্ত্র ইত্যাদি তো যে কোনো শিক্ষিত ভারতীয়কেই পড়তে হবে, পড়াতে হবে এবং পড়ে শোনাতে হবে।

কিন্তু তাই বলে কি সেক্সপিয়ারের নাটক বা মেলার্মের কবিতাকে পড়তে পড়াতে বা শোনাতে যাবার সময় তা কোনো একটা অচলিত এবং আধুনিক জনসমষ্টির কাছে লৌকিক ব্যবহার্য নয় এমন ভাষায় রূপান্তরিত করে শোনাবো? মনে হয় এ যেন আধুনিক ভাষার দ্বিতীয় কন্যাকে বিবাহযোগ্যা দেখে প্রথমা কন্যার প্রতি শুধু সাম্বনামূলক দানসামগ্রী ক্রয় করা। প্রয়োজনটাই বড়, এই অপ্রয়োজনের আনন্দক্ষেত্রেও। তাই আনন্দ মনে আমরা অনুবাদ অবশ্যই করবো প্রয়োজনের দিকটা ভেবে। প্রয়োজনভিত্তিক বোধ নিয়েই অনুবাদ করা হলে, তবেই তার যথার্থ সার্থকতা।

কারণ অনুবাদ তো এক ভাষার সম্পদ অন্য ভাষায় সঞ্চারিত করা। সেই সঞ্চার হবে কি ভাবে? না, সেই ভাষার জনসমষ্টি যখন তা শুনবে, বলবে এবং শোনাবে। কিন্তু যে ভাষার জনসমষ্টিই নেই, সে ভাষায় অনুবাদ করা কোনো চলতি আধুনিক সাহিত্যকে, তা নিছক পাণ্ডিত্য প্রকাশ হতে পারে, তা উন্নত প্রাচীন ভাষায় আধুনিক যুগের সাহিত্যের নিদর্শনকে তুলে ধরলে কেমন দেখায় তার একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতে পারে কিন্তু বর্তমানের মানসিকতার মনন-বর্দ্ধমান যে তার উপলব্ধি তা আসে কি? যা পরিবর্দ্ধিত হয় তাই তো বর্দ্ধমান; এবং যা পরিধিকে পরিবর্দ্ধিত করে, পরিমণ্ডলকে পরিশীলিতও করে। আমাদের ভাষাচর্চা ও শিক্ষা তাই আপন জ্ঞানকে বর্দ্ধমান করা।

মনে আসছে রাজা রামমোহনের কথা। খৃষ্টধর্মের কথা বলতে হলে তিনি দেখলেন মূল বাইবেল পড়া প্রয়োজন। পাদ্রীদের কোনো কথা যদি বলতেই হয়, তা হলে অনুবাদ পড়ে বলা মানে প্রায় পরের মুখে ঝাল খাওয়া হয়ে যায়। তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা করলেন এবং আদি বাইবেল তো হিব্রু ভাষায় লেখা তা পাঠ করলেন। এখানে আজকে যদি কেউ ভাবেন যে, যেহেতু হিব্রু ভাষায় মূল বাইবেল লেখা হয়েছিল অতএব হিব্রু ভাষায় ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যকে অনুবাদ করতে হবে; তা হলে কি হাস্যকর কার্যই হবে না? অনুবাদ তাই প্রয়োজনভিত্তিক কর্ম কোনো সখ বা খেয়াল নয়। বরং হিব্রু ভাষা শিক্ষা করে হিব্রু শাস্ত্রের সকল কিছু মাতৃভাষায় অনুবাদ করলে সেটাই হবে যথার্থ কর্ম বা বিবেচক অনুবাদকের সুকীর্তি।

জার্মান ভাষাভাষী অনেক রয়েছেন তাই তাঁদের ভাষা যেমন শিক্ষা করে অনুবাদের কাজ এগোতে পারে কিন্তু তাই বলে কি ল্যাটিন ভাষার ক্ষেত্রে সেই সুযোগ আছে? অথবা চীনা অথবা জাপানি ভাষার যে বল আছে তা কি তিব্বতীর ক্ষেত্রে আশা করা যেতে পারে? বরং এইসব আজ চলতি ভাষার থেকে মাতৃভাষায় সেইসব সাহিত্যের প্রাচীন শাস্ত্রাদি অনুবাদ করা কাজের কাজ।

কারণ অনুবাদের মূল উদ্দেশ্যটা কি? এক ভাষার ভাবসম্পদ আরেক ভাষার জনসমষ্টির কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। তা বৃহৎ হলেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হয়। কিন্তু আজ জনসমষ্টির স্বল্পতম শিক্ষিত-গোষ্ঠীর জন্যে করলে ক্ষতি নেই কিন্তু তার সাফল্য কতখানি?

আজ মনে আসছে সংবাদে পড়েছি বলেই স্মরণে রয়েছে; ভারতের কোনো এক অঞ্চলের মানুষ যদিও খুবই স্বল্পসংখ্যক তবু তাঁরা নিজেদের ভাষা হিসেবে সংস্কৃতকে মানতে চাইছেন। ভালো। এই সংবাদ যদি সত্যি সত্যিই হয়, তাহলে আনন্দেরই কারণ। কিন্তু তার জন্যে যে পরিশ্রম ও পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন তা কি সেই সংস্কৃত অনুরাগী সমাজের আছে? দু-একজন উৎসাহী, সত্যিই উৎসাহী। কিন্তু অন্যেরা স্রোতে গা ভাসানার দলভুক্ত। নিছক ধাতুরূপ শব্দরূপ ভট্টিকাব্য কণ্ঠস্থ শিক্ষকমাত্র।

কিন্তু প্রাচীন ভাষাকে প্রজ্ঞার ভাষা জেনেই জানতে হবে—এই মন আছে কি? অথবা বিজ্ঞান নিয়েই মাতামাতি তরুণ সমাজের নয় কি? সেখানে লিঙ্গ প্রত্যয় প্রয়োজন কি?

অবশ্য যুগ থেকে যুগান্তরে যে গতি ও প্রগতি, যে বিদ্যা ও বোধিতার অনুরক্তে আবিষ্কার করতে হবে, করাতে হবে এবং নবীন মানসিকতায় প্রসারিত তাকে করতে হবে। এবং সেই কাজে মাতৃভাষা ও মৌখিকভাষায় যতটা সম্ভব অচলিত ঐতিহ্যের ভাষাকে, তার সাহিত্যসম্পদকে প্রচারে ও প্রসারে উদ্যোগী হতে হবে। কিন্তু মাতৃভাষা থেকে সেই অচলিত ভাষায় অনুবাদ নয়, সেই ভাষাকে মাতৃভাষায় ও অনুবাদেই নিজেদের উপযোগী করতে পারা যায় না কি?

আর যারা স্বকীয় মানসিকতায় মৌলিক সংস্কৃতে বা অনুরূপ অচলিত ভাষায় রচনা করতে পারেন তাদের সে কাজ অবশ্যই প্রশংসার ও প্রশস্তির যোগ্য। আজও যে সৃজনশীল সাহিত্য সে ভাষায় সম্ভব তারই তাঁরা নিদর্শন রেখেছেন।

আজ যদি আমরা ভাষার ব্যবহারিক দিকটাকে উপেক্ষা করি তা হলে তো একটা কৃত্রিম পণ্যের কারবারি হয়ে যাবো। আমরা কি মানুষের মনের খোরাক যোগাবো না? আমরা কি তার মানস-যাত্রাকে ঊর্ধ্বও আকাশে উড়তে দেবো না? এই সীমার বন্ধন থেকে অসীমে যেতে হলে তো মুখের ভাষাই মনের ভাষা হয়। তাহলে যে ভাষা আমাদের চলিত নয় তাকে নিয়ে আসবো কেন অনুবাদে। আনতে হলে আনবো মাতৃভাষায় সেই ভাষার বাণী ও বিদ্যাকে তাই সংস্কৃত বা হিব্রু থেকে অনুবাদ করতে হবে আর চলিত ভাষাকে উন্নত করতে হলে অচলিত ঐশ্বর্যময় ভাষাকে শিক্ষা করে মাতৃভাষার উন্নতিবিধান করতে হবে।

আজ অনুবাদ্য বিষয় নির্বাচন তাই অবশ্য বিবেচ্য। কোন ভাষা থেকে করবো? কেন করবো? শুধু ভাষা শিক্ষা করেছি বলেই কি করবো? না কি জন্যে করেছি তা ভেবে করবো? শুধু কেউ কেউ করতেন চিন্তা করে করবো কি? তা হলে তো অনুকরণ কর্মীতে পরিণত হওয়া হয়। তাই কার্যকারণ ভাবাও প্রয়োজন অনুবাদকের।

আর অনুবাদ্য বিষয়কে সুবাদ্য করা প্রয়োজন অর্থাৎ তা যেন পাঠক মনে অনুরণন তোলে। সে অনুরণন তুলতে হলে পাঠকের ভাষায় কথা বলতে হবে, পাঠের লাবণ্যে আর লালিত্যে, বক্তব্যের ব্যঞ্জনায় আর বৈশিষ্ট্যে।

এবং সুপাঠ্য করে ভাষান্তরিত করাতেই অনুবাদ মাধুর্যমণ্ডিত রূপ লাভ করে। শব্দচয়নে ও বাক্যগঠনে বিশেষ সারল্য অথচ আলঙ্কারিক পদ্ধতি অবলম্বন করার ঔচিত্য অবশ্যই স্বীকার্য।

রস পরিবেশনের পরিকল্পনা তো রসিকের জন্যেই। তাই অনুবাদ অনুসরণ করে দেখা প্রয়োজন পাঠকের কানের ভিতর দিয়ে যেন মর্মে সুবাদ্য মনে হয় আর রসনায় সুপাচ্য মনে হয়। এবং রচনার সার্থকতাও মনে হয় সেখানেই।

হরিনাথ দে বহু ভাষাবিদ রূপে সুবিদিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হালের আমলে আচার্যরূপে প্রণম্য। কিন্তু তাঁদের দক্ষ হাতের অজস্র ভাষা থেকে অজস্র ভাবের অনুবাদ মাতৃভাষার হয়নি। তাঁরা যতটা শিখেছেন ঠিক ততটাই যে শিখিয়েছেন কিনা জানা যাবে কি? কারণ অনুবাদের পথে তাঁদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল না। আজকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতাবাসের

সঙ্গে ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেও ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। অনেকে আবার পরস্পরে আদান-প্রদান করে নিজের নিজের মাতৃভাষা শিক্ষা দিয়ে ভাষা শিক্ষা করে থাকেন। অর্থাৎ একজন ফরাসী সাহেবকে একজন বঙ্গদেশীয় মহিলা ধরা যাক বাংলা শিক্ষা দিলেন আর তার পরিবর্তে সেই ফরাসী সাহেব বঙ্গমহিলাকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিয়ে গেলেন। আবার টেপ রেকর্ডে ও পত্রালাপেও ভাষা শিক্ষা চালু আছে। আসলে ভাষাশিক্ষাটা বড় কথা নয় ভাষান্তরিত করার মন ও মানসিকতার প্রয়োজন। কারণ চেষ্টা করে কোনো কোনো ভাষা শেখা যতটা যাচ্ছে কিন্তু কিছু অনুবাদ করার চেষ্টা এতটা করতে দেখা যাচ্ছেনা বিশেষ। অথচ বাংলা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে অনুবাদ আজ আবশ্যকীয়ই। বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে বিবিধ রত্নরাজি রয়েছে তা দূরদেশের অপর ভাষাভাষীর মনের দরবারে পৌছিয়ে দেওয়া তো আজ বিশেষ প্রয়োজন।

আধুনিক সাহিত্যে অনুবাদ যা হচ্ছে তা কি যথেষ্ট? তা যদি হয়, তাহলে বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথের পর বঙ্গসাহিত্যের মান যে কি তা বিশ্বসাহিত্যিক সমাজ জানছে কই? আমাদের চেষ্টা হচ্ছে কি দেশের মধ্যে বড়দরের লেখককে বড় আরো বড় করে দেশবিদেশে পৌছিয়ে দেওয়ার? দেশ তো বড় হবে বিদেশে দেশের মানুষের সম্মান আর সমাদর পেলেই। তাই অনুবাদ একটা অবশ্য করণীয় কর্মরূপে শিক্ষিত সমাজের অগ্রণীকর্ম। কিন্তু একটা কাগজ বা কোনো কোনো বই হঠাৎ হঠাৎ প্রকাশে তা আর কতটুকু হবে। কিন্তু বিদেশী মনীষীর ও নামী সাহিত্যিকের রচনা অনুবাদ করে গ্রন্থাবলীও হচ্ছে। আজ মননশীল গ্রন্থেরও যথেষ্ট অনুবাদ হচ্ছে। তবে বহু ভাষা থেকে কি? বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষা থেকেও কি?

সেটাই আক্ষেপের। এবং বিষয়টি উপেক্ষার হবে না বলেই বিশ্বাস রাখি।

ভাষার ব্যবধান তোলা যাবেও না, যায়ও না। তা হলে কি ভাবের আদান-প্রদান হবে না? অনুবাদই তো সেই ভাবের গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের মতো যুগল-বন্ধনের মিলনক্ষেত্র। তাই বলতে হয় অনুবাদ আধুনিক যুগেও অপরিহার্য।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের হারিয়ে যাওয়া একটি তথ্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

ব্যাধি হ'লে চিকিৎসকের সাহায্যে তা সারান যায়, একটু কঠিন হ'লে হাসপাতলের আশ্রয় নিতে হয়, কিন্তু সবই তো শহরে সুলভ্য, গ্রামে দুইই দুর্লভ্য।

তাই আজকের দিনে ভারতবাসীর মনে জাগছে খাদ্য পানীয় এমন কি ঔষধেও তো ভেজালের থাবা সম্পূর্ণ প্রকট, তা হলে কি এমন সুগম পন্থা আছে, যা অল্প কথায় মনে রাখতে পারি এই ভাবে চললে এই ভেজাল বৈভবের মাঝেও আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারি?

মহাভারতকার এমনি প্রশ্ন তুলেই যেন প্রশ্নোত্তর দিয়েছিলেন পঞ্চ পাণ্ডবকে বনবাসের আগে, যদিও সেটা ভেজাল খাদ্যের যুগ ছিল না, কিন্তু কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষা প্রভৃতি দেহ মনের বৃত্তিগুলি যে প্রবল ছিল সেযুগে তাতো গ্রন্থকার লুকিয়ে রাখেননি! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য এবং কুরুবংশ, যদুবংশের জীবন-চরিতগুলিতেইতো মানুষের ভেজাল মনোবৃত্তির নিদর্শন রেখেছেন।

তেমন দিনেই পাণ্ডবদের বনবাস ঘটেছিল। সেই বনবাস শুরু হয় যেদিন, সেই দিনের সকালে পাণ্ডবদের যাঁরা অনুগামী হয়েছিলেন, তাঁদের আর অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন যুধিষ্ঠির, বললেন—

বয়ংহি হৃতস্বর্বসা হৃতরাজ্যা হৃতশ্রিয়ঃ।
কিং পুনর্মামিতো বিপ্রা নিবর্ত্তধ্বং যথেষ্টতঃ

মহাশয়গণ! আপনারা ফিরে যান, আর আমাদের অনুগমন করবেন না, আমরা এখন রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট, মানভ্রষ্ট, কিছুই আর নাই, আপনাদের সামান্য সেবাও করতে পারবো না, পথে পথে উপবাসও ঘটবে কবে, সেদিন আপনারাও আমাদের সঙ্গে উপবাসী হয়ে থাকবেন এটা আমি সইতে পারবো না, অনুগ্রহ করে ফিরে যান।

সহগামীরাও যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে আবেদন করেছিলেন, অনুগ্রহ করে ও আদেশ করবেন না— অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁরা তা বুঝিয়ে ছিলেন কেন তাঁরা সহগামী হতে চান। তবুও যুধিষ্ঠির বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন বেশ! আপনারা আদেশ করুন পথযাত্রী হয়ে দীর্ঘকাল থাকতে হবে যখন, তখন উপদেশ করুন কি ভাবে থাকবো আমরা।

সহযাত্রীরা তাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করে বলেছিলেন—দেখুন, সর্বাগ্রে প্রয়োজন শরীর ও মনকে সুস্থ রাখা। মহাশয়! আমরা জানি, অর্থকৃচ্ছতায় আপনারা ক্লান্ত হবেন না, তার জন্য অতীতের রাজ-সুখ স্মরণ করেও নিরাশ হবেন না, তবে, যে বিষয়টা মানুষের সহজগোচরে আসে না, সেটা হ'লো শারীরিক ও মানসিক দুঃখ বা ব্যাধি। এ জগতে কেউই এ দুটি ব্যাধি থেকে রেহাই পায় না।

মনো দেহ সমুত্থাভ্যাং দুঃখাভ্যামর্দিতং জগৎ।
তয়োর্ব্যাস সমাসাভ্যাং সমোপায়মিমংশৃণু।
ব্যাধেরনিষ্ট সংস্পর্শাৎ শ্রমদিষ্ট বিবর্জনাৎ ।।
দুঃখং চতুর্ভিঃ শারীরং কারণং সম্প্রবর্ত্ততে ।।

মতিমন্তো হৃতোবৈদ্যাঃ শমং প্রাগেব কুর্বতে।
ধন্বন্তরেহিতং বাক্যং শারীরং মানসং প্রতি।
যদুক্তং শ্রূয়তাং তদ্ধি জনকেন যথা পুরা।

অর্থাৎ মানসিক দুঃখ আর শারীর দুঃখই মানস ব্যাধি ও শরীর ব্যাধি। এদের প্রশমনের উপায়ই জানিয়ে দেন বৈদ্যগণ। তাঁরা ধন্বন্তরির যে সদুক্তি আছে, যা জনক রাজাই প্রথমে জেনেছিলেন এবং জনসাধারণকে শুনিয়েছিলেন, সেই সদুক্তিই আপনাকে শোনাই, এই সদুক্তি শুনে পালন করলে আপনারা সুদীর্ঘকাল অসহায়ভাবে বনে থাকলেও শারীর ব্যাধি ও মানস ব্যাধিতে আক্রান্ত হবেন না।

কোন এক সময় জনক রাজের গৃহে উপনীত হয়েছিলেন এক ঋষি, তিনি প্রায়ই আগমন করতেন দৈববাণী শুনে সেই বাণী প্রিয়জনকে শোনাতেন। সেদিন শোনালেন এক অত্যদ্ভুত কথা—ভগবান ধন্বন্তরি মর্ত্যলোকে আগমন করেছেন দেখে একটি অপূর্ব সদুক্তি করে একটি পক্ষী তাঁকে ঘিরে উড়ছিল। সদুক্তিটি এই—কোঽহম্ কোঽহম্ কোঽহম্! অর্থাৎ এ সংসারে কে অ রোগী? কে অ-রোগী? কে অ-রোগী?

ভগবান তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

(১) প্রাবৃষি ন ভ্রাম্যতি শরদি ভক্ষ্যতি
ভক্ষ্যতি হিম-শিশিরান্তে।
স্বপিতি নিদাঘে ভ্রমতি বসন্তে
সোঽহম্, সোঽহম্, সোঽহম্॥

অর্থাৎ যে বর্ষাকালে বেড়ায় না, শরৎকালে বেশী খায় না, আর হিম ও শিশির ঋতুর অন্তে খায়, এবং গ্রীষ্মে ঘুমোয়, বসন্তে বেড়ায় সেই অ-অরোগী, সেই অরোগী

ধন্বন্তরির এই উত্তর শুনেও পাখীটি আবার বল্লে—কোঽহম্? কোঽহম্? কোঽহম্?

ভগবান ধন্বন্তরি পাখীটির পুনরুক্তি শুনে মৃদু হেসে বল্লেন—

(২) জীর্ণে হিতমিত ভোজী শতপদগামী বামশায়ী।
ব্যায়ামী ঋতুভুক্ সোঽহম্ সোঽহম্ সোঽহম্॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আহার্য জীর্ণ হলে খায়, হিতকর খায়, পরিমাণমত খায়, আহারের পর একশো পা গুনে গুনে হাঁটে সেই অরোগী, সেই অরোগী সেই অ-রোগী।

ধন্বন্তরির এই দ্বিতীয় বারের প্রত্যুত্তর শুনেও কিন্তু পাখীটি নীরব হ'লো না। আবার তেমনি স্বরে ডেকে সেই কথাগুলিরই আবৃত্তি করলো। ধন্বন্তরি বুঝলেন পাখীটি আরও সরল সহজ ভাষায় জানতে চায়। তখনই তিনি সরল অনুষ্টুপ ছন্দে একটি শ্লোকে উত্তর দিলেন—

(৩) ভোজনান্তে পিবেৎ তক্রং বাসরান্তে পিবেৎপয়ঃ।
নিশান্তে চ পিবেদ্ বারি সোঽহম্ ভবতি সর্বথা॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নের আহার শেষে টাট্‌কা ঘোল পান করে, যে ব্যক্তি রাত্রের আহারের শেষে দুগ্ধ পান করে আর রাত্রি শেষে পবিত্র শীতল জল পান করে সেই অ-রোগী সেই অ-রোগী সেই

অ-রোগী।

ধন্বন্তরির এই ত্রি সত্য উত্তরে পাখীটি নীরব হয়ে উড়ে গেল। জনক রাজা শুনে প্রচুর বিস্ময় ও প্রচুর তৃপ্তি পেলেন। মানবের সু-স্বাস্থ্য রক্ষার চিরন্তনী এই দৈব-বাণীটি যেদিন বৈদ্যবৃন্দের কর্ণগোচর হয় সেদিন তাঁরা বুঝেছিলেন, ও বাণীকে ভারতীয় বৈদ্যক-শাস্ত্রে অন্তর্গত করে প্রচার প্রয়োজন, যাতে যে কোন দেশের মানুষ একান্ত করে নিতে পারে, তাই তাঁরা ওই বাণীর নবরূপ দান করে লিখে গিয়েছেন—

অ-শাকভোজী স ঘৃতান্ন সেবী
নির্বারিভুক্তে স পয়োরসং যঃ।
ঋতং হিতং যশ্চ মিতম্ যথর্তু
ব্যায়াম কৃৎ জীর্ণভুগেব সোঽহম্॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আহারের সময় শাকের ব্যঞ্জন খায় না, প্রত্যহ অন্নের সঙ্গে ঘি মিশিয়ে খায়, খেতে খেতে জলপান করে না (শ্বাসরোগী আহারের অনেক পরে জলপান করবে) আহারের পর কিছু কিছু দুধ পান করে, তাছাড়া হিতকর আহার্য গ্রহণ করে (সংযোগ বিরুদ্ধ নয়) পরিমাণমত আহার্য খায়, ঋতু ও প্রকৃতি-সাত্ম্য খায়, ব্যায়াম করে, খাদ্য জীর্ণ হইলেই খায় নচেৎ খায় না, সেই ব্যক্তিই অ-রোগী।

সমালোচনা

উনিশ শতকের বাঙলা-সাহিত্যে কেশবচন্দ্র—ঋতা বসু ; জিজ্ঞাসা : ১৩৩-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯, পৃঃ ২৮৪, মূল্য : পঁচিশ টাকা।

উনিশ শতকের বাংলা সব দিক দিয়েই সোনার বাংলা। এই শতকে বাংলাদেশে সোনা-হীরে-মাণিকের ছড়াছড়ি। তাদের চোখ ঝল্‌সানো দ্যুতিতে সারা পৃথিবী ঝল্‌সে উঠেছিল। মনীষী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন বাংলাদেশের এমনি এক দ্যুতিময় হীরকখণ্ড। এক দুর্লভ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কেশবচন্দ্র মুখ্যত ধর্মতাত্ত্বিক গোত্রীত সাহিত্যিক। তাঁর ধর্মচিন্তাকে নিয়েই অধিকাংশ গ্রন্থ ইংরেজী ও বাংলাভাষায় প্রণীত হয়েছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যচিন্তার পরিচয়বাহী একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু নেই বললেই চলে। যদিও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু প্রবন্ধে বা কিছু সাহিত্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থে আংশিকভাবে সাহিত্য-সাধক কেশবচন্দ্র আলোচিত হয়েছেন ; তবুও ঋতা বসুর 'উনিশ শতকে বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র' এই প্রসঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীমতী বসু আলোচনার সুবিধার জন্য গ্রন্থটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম অধ্যায় : ব্রাহ্ম আন্দোলন ও নববিধান পর্যায়ে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস, আভ্যন্তরীণ কলহ এবং নব-বিধানের প্রবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন লেখক ইতোপূর্বে কেশবচন্দ্রকে যেভাবে উপস্থাপনা করেছেন, তাঁদের উপস্থাপনা ও মতামতের ভিত্তিতেই কেশবচন্দ্রের আবরণ উন্মোচনের প্রয়াস করেছেন লেখিকা। তাঁর নিজস্ব বক্তব্য কিছু নেই। মাঝে মাঝে দু-একটি মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। মনে হয়, লেখিকা নিজেও পরিষ্কার নন। শ্রীমতী বসু তাঁর গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠার এক অংশে লিখেছেন—'তাঁর সাধনার পথে কোন গুরু বা ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব নেই।" ঐ পৃষ্ঠারই কয়েকটি পংক্তির পর লিখেছেন—'পূর্বজীবনে যীশুখৃষ্ট তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্ম তাঁর সাধনমার্গকে প্রভাবিত করেছে।'

মানুষের সর্বানুভূতির সম্যক্ পরিচয় প্রকাশ করেন সাহিত্যিক। বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে সাহিত্যিক, সেই অর্থে কেশবচন্দ্রকে সাহিত্যিক বলা যায় না। একটা মাত্র বিশিষ্ট অনুভূতির ওপরই গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সর্ববিধ রচনায়। যদিও কেশবচন্দ্র যত বক্তৃতা করেছেন, লিখেছেন তার চেয়ে অনেক কম। আর বাংলা থেকে ইংরেজীতেই তাঁর রচনার পরিমাণ বেশি। বাংলা রচনার অধিকাংশই আবার অনুলিখিত ; অর্থাৎ তাঁর ভাষণ বা বিবৃতি অপরের দ্বারা লিখিত হয়েছে। সেই অর্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের অবদানকে স্বকীয়তার ভিত্তিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলতে কুণ্ঠিত হতে হয়। এক্ষেত্রে শ্রীমতী বসু একটু বেশি মাত্রায় কেশব সাহিত্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন যেটা কোনমতেই স্বীকার করা যায় না।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় জুড়ে কেশবচন্দ্রের বিভিন্ন জাতীয় রচনার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও লেখিকার কোন মৌলিক চিন্তার পরিচয় প্রকাশ পায়নি। পূর্ববর্তী আলোচকগণ যে দৃষ্টিতে কেশব সাহিত্যকে দেখেছেন, তিনিও তাই দেখেছেন, কোথাও অভিনবত্ব নেই।

গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়টি শ্রীমতী বসু নববিধান সাহিত্যের অন্যান্য লেখকগণের পরিচয় দিয়ে অনেকাংশে গ্রন্থটির মহিমা ক্ষুণ্ন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক সম্প্রদায় যে বিশিষ্টতা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেরকম কোন বৈশিষ্ট্য নববিধান সাহিত্য গোষ্ঠীর দু-একজন ছাড়া আর কারো মধ্যে লক্ষণীয় নয়। অথচ শ্রীমতী বসু সাহিত্যপদবাচ্য নয়, এমন লেখক বা লেখিকার রচনাদির আলোচনায় মুখর হয়েছেন। এটা তাঁর একটা ব্যর্থ শ্রমের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো।

পঞ্চম বা শেষ অধ্যায়টিতে নববিধান সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখিকা পুনরুক্তি দোষের শিকার হয়েছেন। এটা হয়েছে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা মাত্র। সর্বোপরি এই অধ্যায়ে শ্রীমতী বসু বিভিন্ন অলংকারের নিদর্শন উদ্ধৃত করে গবেষণাগ্রন্থটিকে ছাত্রপাঠ্য অলংকার গ্রন্থের সামিল করে তুলেছেন। এটা নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত।

উপসংহারে বলি যে গবেষণাগ্রন্থের একটি অপরিহার্য অঙ্গ নির্ঘণ্ট। পরবর্তী সংস্করণে শ্রীমতী বসু এ বিষয়ে নিশ্চয়ই সতর্ক হবেন। দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যাদির একত্র সমাবেশের জন্য শ্রীমতী বসুর গ্রন্থটি যে প্রতিটি গ্রন্থাগারে সংরক্ষণযোগ্য তা অবশ্যই স্বীকার্য।

অধীর দে

নদী। ডঃ সুপ্রিয় সেনগুপ্ত। জিজ্ঞাসা। কলেজ রো, কলিকাতা।

'বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালার' অন্তর্গত ডঃ সুপ্রিয় সেনগুপ্তর 'নদী' বইটির জন্য প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা' পাবলিকেশনস (প্রা) লিমিটেডকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে হয়। সমস্ত পুস্তক প্রকাশনার মূল আদর্শ "মানুষকে শিক্ষিত করা" থেকে সরে এসে অধিকাংশ বই যখন সস্তা বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত, তখন 'জিজ্ঞাসা'র সেই আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য।

ভূতত্ত্বের অধ্যাপক এবং বিশেষতঃ নদীবাহিত পলন ও পাললিক শিলা বিশেষজ্ঞ শ্রীসেনগুপ্ত স্বল্প পরিসরে (৬০ পৃষ্ঠা) 'নদী'র মত এক জটিল এবং দুরূহ বিষয় নিয়ে দুটি অধ্যায় আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে নদীর গঠন ; প্রবাহের প্রকৃতি বিশেষতঃ নদী বাহিত জল ও পলির বিচিত্র কর্মকাণ্ড এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের নদীর সমস্যা আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক খুব বেশী ওয়াকিবহাল নয়। ভাষার মত নদীও একটা নির্দিষ্ট ব্যাকরণ মেনে চলে। শ্রীসেনগুপ্ত সেই আপাততঃ নীরস এবং কঠিন ব্যাকরণকেই অত্যন্ত সহজ অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাবার গুরুদায়িত্ব প্রশংসনীয় ভঙ্গীতে পালন করেছেন। এই অধ্যায়ের আলোচনায় অবশ্য নদীর বিভিন্ন গঠন ও কার্যপ্রণালীর ইংরাজী সংজ্ঞার

যথোচিত বাংলা রূপান্তর করতে গিয়ে শ্রীসেনগুপ্ত পদে পদে দ্বিধা এবং অসুবিধায় কণ্টকিত হয়েছেন। যেমন দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই Dendritic Pattern-এর নদীর কথা বলার পরেই সন্ধিযুক্ত শিলার ওপরে নদীর প্রবাহের কথা আলোচনা করেছেন। কিন্তু তার ফলে যে Trellis Pattern-এর উৎপত্তি হয় তার কথা বলতে গিয়েও উপযুক্ত প্রতিভাষার অভাবে শ্রীসেনগুপ্ত হঠাৎ থেমে গিয়েছেন। শ্রীসেনগুপ্তের অসুবিধা কোথায় তা আমরা বুঝি। কিন্তু সমালোচনা বা উপদেশ নয়, তাকে আমাদের অনুরোধ অথবা দাবীও বলা যেতে পারে যে তিনি যেন সেই সব বাধাকে নদীর মতই ভাসিয়ে নিয়ে যান; এবং নদী সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যার অবতারণা করেন। আমাদের স্থির বিশ্বাস তিনি সেই শক্তি রাখেন। থেমে গেলে থেমেই থাকবে। বাংলা ভাষায় এতদিন পরে এই ধরণের আলোচনার সূত্রপাত যখন হয়েছেই শেষও করতে হবে, সে যে ভাবেই হোক। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি --নদীর Radial Pattern, তারপর Antecedent, Consequent, Subsequenr ইত্যাদি নদী চরিত্র উদাহরণ এবং অবশ্যই ছবি সহযোগে একটু দিলে ভাল হয়। যদিও জানি শুধু পশ্চিমবঙ্গের নদীর সাথে এদের অনেকেরই হয়ত কোন গভীর সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের নদী সমূহের উৎপত্তি, গঠন, বিবর্তন এবং সমস্যার বর্ণনায় শ্রীসেনগুপ্ত আরও সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ। অজস্র তত্ত্ব এবং তথ্যের সমাবেশ হলেও রসগ্রাহী আলোচনার জন্য লেখাটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যখন বিদ্যুৎ, বন্যা এবং কলকাতা বন্দরের নাব্যতা ও শহরের জলনিকাশী সমস্যায় প্রতিনিয়ত জর্জরিত হচ্ছে তখন দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তু সবার কাছেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। অনেকগুলি তথ্য একদিকে যেমন শিক্ষণীয়, তেমনি আকর্ষণীয়।

নদী সম্বন্ধে এই আলোচনার পাশাপাশি অনেকগুলি ছবি, ম্যাপ এবং চার্ট বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ম্যাপগুলি উন্নতমানের হলেও চার্ট এবং ছবিগুলির প্রশংসা করতে পারছি না। এই ধরণের আলোচনায় ম্যাপ চার্ট এবং ছবির গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে তারা লেখার মানের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে ছন্দপতন ঘটার সম্ভাবনা। বইটির প্রথম অধ্যায়ে সেটি ঘটেছে। কয়েকটি আলোচিত ভৌগোলিক বিষয়বস্তুর ফটো দিতে পারলে মনে হয় সব থেকে ভাল হত। মুদ্রণ ব্যয়ের কথা স্মরণে রেখে মনে হয় সাধ থাকলেও আমাদের সাধ্যে তা কুলায় না।

সে যাই হোক সব মিলিয়ে 'নদী' বইটি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে ছোটোর মধ্যে ডঃ সেনগুপ্ত এবং জিজ্ঞাসার একটি সুন্দর এবং সাহসিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা। দু একটি বানান ভুল থাকলেও বইটিতে আগাগোড়া যত্নের ছাপ সুস্পষ্ট। দামের (৫)—ক্ষেত্রেও পাঠককে প্রতি সুবিচার করা হয়েছে বলেই মনে হয়।

ত্রিদিবকুমার বসু